স্নেহলতা।

(উপন্যাস।)

[শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ পুস্তকালয় হইতে]

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

স্নেহলতা।

(উপন্যাস।)

"সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি, মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ।
মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি, দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ॥"

[১১১ নং আপার চিৎপুর রোড হইতে]

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

৯ই ভাদ্র ১৩০১ সাল।

[মূল্য

NATIONAL LIBRARY
No. 29116
Date 31. 8. 74
CALCUTTA

E
B
891.443
A 7199

স্নেহলতা।

K. B. ROY
SOLE PROPRIETOR
1896.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিধের্বিচিত্রঃ করুণাবিকাশো।
ভাগ্যেন রত্নং সহসা প্রপন্নং ॥

বাটী হইতে যাইবার সময় সুরেন্দ্রের মাতা বলিয়া দিয়াছিলেন, "বিদেশে যাইতেছ, সন্ধ্যা না হইতেই বাসা লইও।" আজ বৈশাখমাস, দিবা অবসান প্রায়; বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সুরেন্দ্রের সে কথা মনে পড়িল। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমগগনে নবনীরদমালা সজ্জিত হইল। সুরেন্দ্র সত্বর হইলেন; চতুর্দ্দিকে সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সম্মুখে একখানি গ্রাম দেখা যাইতেছে; বৃষ্টি আসিবার পূর্ব্বেই ঐ গ্রামে যাইতে হইবেক, এই বিবেচনা করিয়া সুরেন্দ্র এক প্রকার ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। একচতুর্থাংশ পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই, মহাসমারোহে ঝড় বৃষ্টি ও মুহুর্মুহু বিদ্যুৎধ্বনি হইতে লাগিল।

ঈশ্বরের করুণা বিচিত্র! তিনি সকল অবস্থাতেই মনুষ্যের উপায় সংস্থান করিয়া দেন; কি স্বদেশ কি বিদেশ, কি প্রান্তর কি পর্ব্বত, সর্ব্বস্থানেই তিনি মনুষ্যের একমাত্র শরণ ও অদ্বি-

তীয় অবলম্বন! নিকটে এক প্রাচীন মন্দির ছিল, তাহাই সুরেন্দ্রের প্রাণ-রক্ষার কারণ হইল।

সুরেন্দ্র সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের চূড়া-দেশ বৃক্ষবল্লীতে সমাচ্ছন্ন, কালের অনিবার্য্য স্রোতে মন্দিরের বিপুল কলেবর অর্দ্ধ বিসর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মনুষ্যের সমাগম নাই, কোন দেবমূর্ত্তি নাই, কেবল কতকগুলি ভগ্ন ইষ্টক পড়িয়া রহিয়াছে।

অবিলম্বে সন্ধ্যা হইল। সুরেন্দ্র একাকী সেই মন্দির মধ্যে বসিয়া রহিলেন। দুর্নিবার ঝটিকা ও বৃষ্টি নৈশ অন্ধকারে কি ভয়ানক মূর্ত্তিই ধারণ করিল! কোথায়ও মনুষ্যের সাড়া শব্দ নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে ঘোরতর বজ্রধ্বনি ভয়ঙ্কর নিনাদে হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছে। সুরেন্দ্র কোন দিন বিদেশে আসেন নাই, তাহাতে বয়সও তত অধিক নহে; যদিচ বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, বাল্যকালসুলভ ভয় এখনও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। সুরেন্দ্র ভয়ে অচেতন প্রায় হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দ্বারদেশে এক ভয়ানক চীৎকার শুনিতে পাইলেন,—"এখানে কে আছ, আমায় রক্ষা কর।"

সুরেন্দ্র সত্বর হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন; ভয়ে তাঁহার সর্ব্ব-শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল;—কম্পান্বিত কলেবরে দ্বারদেশে আসিয়া বিদ্যুতের আলোকে দেখিলেন, মন্দিরের সম্মুখে কে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে; দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কেও!" কোন উত্তর পাইলেন না; পুনরায় বিদ্যুৎ হইল, দেখিলেন, সত্য সত্যই কে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশয়নে রহিয়াছে।

ক্রমে ঝড় আসিল; বৃষ্টির বেগও পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইল; সুরেন্দ্র ধরাশায়িতের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পুনরায় যখন বিদ্যুদালোকে দেখিলেন, একটী অমিতরূপশালিনী বালিকা ধরাশয়নে পড়িয়া রহিয়াছে, তখন তাঁহার অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় কৌতূহলের উদয় হইল। এই ভয়ানক প্রান্তরে এই দুঃসময়ে একাকিনী রমণী কে, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তিনি অনন্যমনে তাঁহার মূর্চ্ছাপনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বালিকার মূর্চ্ছা অধিক কাল রহিল না। তিনি অল্পায়াসেই নয়ন উন্মীলন করিয়া কহিলেন, "দাদা! আমরা কোথায়?" সুরেন্দ্র কহিলেন, "তোমার দাদা এখনই আসিবেন; তোমার কিসের অভাব বোধ হইতেছে বল।"

বালিকা। আমি বাড়ী যাইব, আমার দাদা কোথায়? আমরা দুর্গাপুরে যাইতেছিলাম।

সুরেন্দ্র। কোন চিন্তা নাই, তোমার দাদা বোধ হয় এখনই আসিবেন; না হয় আমি যে কোন প্রকারে তোমাকে অদ্যই বাড়ী পৌছাইয়া দিব।

এই সময়ে চন্দ্রালোকে দিগন্ত বিভাসিত হইলে, সুরেন্দ্র দেখিতে পাইতেন, সেই নিদারুণ প্রান্তরে নিদাঘাকাশ-তাড়িতা সঙ্গিবিরহিতা কাতরা বালিকার মুখমণ্ডল কি ভাব ধারণ করিয়াছে। যে লোকচমৎকারিণী চপলাদেবী এতক্ষণ অনাহূতভাবে মুহুর্মুহু দর্শন দিতেছিলেন, তিনিও তখন অন্তর্হিত হইয়াছেন। বালিকার নিকট সুরেন্দ্রের কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু তিনি জিহ্বাকে সংযত করিলেন; এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে তাঁহাকে দুর্গাপুর পৌছাইয়া দিবেন।

এই সময়ে বালিকা নীরবে কাঁদিতেছিল, সুরেন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "কাঁদিও না; তোমার দাদার নাম কি? কোথা হইতে তাঁহাদিগের সহিত ছাড়াছাড়ি হইয়াছে?"

বালিকা উত্তর করিল, "তাহা আমি জানি না, আমার দাদার নাম বিপিনবাবু।"

এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে "বিপিনবাবু" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বিপিনবাবু ঝটিকা-বিতাড়িত হইয়া স্নেহলতাকে হারাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অধিক দূরে যান নাই, তিনি নিকটেই স্নেহলতার অন্বেষণ করিতেছিলেন। প্রবল বায়ুতে পাল্কীখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বাহকদিগের উদ্দেশ ছিল না, তাহারা পাল্কী রক্ষা করিতে গিয়াছিল; ভাগ্যে স্নেহলতা পূর্ব্বেই পাল্কী হইতে বাহির হইয়াছিলেন, নচেৎ সেই ঝটিকাতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন হইত।

সুরেন্দ্রের ডাক শুনিয়া বিপিনবাবুর হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, তিনি আগত শব্দানুসারে ঊর্দ্ধশ্বাসে মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মোহাতুরাণামিব বালবুদ্ধ্যা
তস্মাপি চিন্তা মহতী ব্যজায়ত।

দুর্গাপুরে দুর্গাদাসবাবু একজন ক্ষুদ্র জমীদার, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং মতে পরমহিন্দু। বাটীতে প্রাচীন প্রথানুসারে নিত্যই দেব দেবীর পূজার্চ্চনা হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আত্মীয় স্বজন, সকলেই তাঁহার নিকট পরম সমাদরের পাত্র। তাঁহার বয়স পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষের অধিক নহে; কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, ধীরতা প্রভৃতিতে অশীতি বর্ষীয় ব্যক্তিও তাঁহার সমকক্ষ নহেন।

দুর্গাদাসবাবু আজ তিন দিন হইল বিপিনকে স্বীয় শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়াছেন। অদ্য তাহার আসিবার কথা, কিন্তু রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া যায়, তথাপি তাহার উদ্দেশ নাই। বিপিনের জন্য তাঁহার তত ভাবনা নহে, ভাবনা প্রাণাধিকা স্নেহলতার জন্য। স্নেহলতা মাতুল গৃহে ছিল, তাহাকে আনিবার জন্যই বিপিন তথায় প্রেরিত হয়েন।

সে রাত্রি দুর্গাদাসবাবু বড়ই উদ্বেগে কাটাইলেন। পর দিন প্রভাতে জনৈক লোক পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, স্নেহলতা আসিতেছে,—সঙ্গে বিপিন এবং আর একটী বাবু।

শুনিয়া দুর্গাদাসবাবু আশ্বস্ত হইলেন; তিনি মুহূর্ত্তকাল তাহাদিগের আশাপথে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই স্নেহলতার

বিমল জ্যোতিতে পথ আলোকিত হইল। স্নেহলতার কাতর মুখশ্রীতে স্বাভাবিক জ্যোতি ও প্রতিভার কিছুমাত্র হ্রাস লক্ষিত হইতেছে না। স্নেহলতার নাতিপ্রফুল্ল অধরে কি মনোহর শোভাই প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গাদাসবাবু "মা মা" বলিয়া সাদরে কন্যাকে কোলে লইলেন।

বিপিন দুর্গাদাসবাবুর নিকট সুরেন্দ্রকে পরিচিত করিয়া দিলেন, এবং কহিলেন, "ইনি তাদৃশ যত্ন না করিলে, সেই প্রান্তরে স্নেহলতার উদ্দেশ পাওয়া ভার হইত।" দুর্গাদাসবাবু আদ্যোপান্ত শুনিয়া সুরেন্দ্রের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে আদেশ করিলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সুরেন্দ্রের নাম গ্রামের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধবনিতা, যাহারা স্নেহলতাকে ভালবাসিত, সুরেন্দ্রকে এক একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিল না। সুরেন্দ্র দুর্গাদাসবাবুর নূতন জামাতার আদর পাইতে লাগিলেন। স্নেহলতার মাতা তাঁহার সহিত অসঙ্কুচিতভাবে নাম ধাম জিজ্ঞাসা প্রভৃতি বহুবিধ আলাপ করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্র তথায় তিন দিন থাকিলেন। এই সময়ের মধ্যে স্নেহলতার মনোরম মুখশ্রী, সুঠাম গঠন, কোমল ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ে এপ্রকার অঙ্কিত হইল, যে তাহা যেন আর এ জনমে অপনীত হইবার নহে। স্নেহলতা কি প্রকার হাঁটিয়া যায়, কেমন করিয়া হাসে, কি ভাবে কথা কয়, সুরেন্দ্র ইহা বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন। স্নেহলতা সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত করিয়া বসিলে যেরূপ দেখায়, সুরেন্দ্র তাহা মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলেন।

প্রথম দিন হইতেই স্নেহলতার মা সুরেন্দ্রকে দাদা বলিয়া ডাকিতে স্নেহলতাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন; আজ তিন দিন স্নেহলতা প্রাণপণে মাতৃ আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে; প্রতিদিন প্রয়োজনাতিরিক্ত তিন চারিবার দাদা বলিয়া ডাকিয়া দেখিয়াছে, নূতন দাদা কেমন উত্তর দেয়; সেই বসন্ত কোকিলের স্বর সুরেন্দ্রের হৃদয়ে এমন বিদ্ধ হইয়াছিল যে, আজি প্রস্থান কালেও তিনি তাহা পুনরায় শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। দুর্গাদাসবাবু তাঁহাকে বলিলেন, সুরেন্দ্র! এদেশে আসিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, আমি পুনরায় তোমাকে দেখিলে যে কি পর্য্যন্ত সন্তোষ লাভ করিব, তাহা বলিতে পারি না, এইক্ষণ তুমি অনেক দিন বাটী হইতে আসিয়াছ, তোমার মাতা না জানি তোমার জন্য কতই ব্যস্ত হইয়াছেন; এরূপ স্থলে তোমাকে অধিক দিন রাখিলে পাছে তাঁহার মনঃপীড়ার কারণ হই, এই নিমিত্ত অনিচ্ছাসত্বেও তোমাকে যাইতে দিতেছি।

সুরেন্দ্র প্রণতিপূর্ব্বক বিদায় হইলেন। প্রস্থানকালে স্নেহলতা তাঁহার কাছে আসিল না, তাঁহাকে একবার ডাকিল না, পুনরায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেল না কেন, সুরেন্দ্র ধীরপদ-বিক্ষেপে নিক্রান্ত হইতে হইতে চিন্তা করিলেন, ইহার কারণ কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

উদারচরিতানান্তু
বসুধৈব কুটুম্বকম্।

সন্ধ্যা সমাগত। মৃদুল বাতাস বহিয়া ক্লান্ত জীবগণের শরীর জুড়াইতেছে, পথিকেরা শশব্যস্তে আপন আপন বাসা লইতেছে। মথুরাপুর গ্রামের সন্নিকটে একটি বিংশতি বর্ষীয় যুবক কৃষকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, এই গ্রামে ভদ্রলোক আছে? কৃষকেরা উত্তর করিল, এই গ্রামে চারি পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণ ও দশ বার ঘর কায়স্থের বাস; আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?

যুবক। আমার দেশ অনেক দূরে, এখন সন্ধ্যা উপস্থিত, কোথায় যাই; নিকটে ভদ্রলোকের বাটী থাকিলে অতিথি হইতাম।

কৃষকেরা বলিল, "এই গ্রামে মুকুন্দ ঠাকুরের বাড়ীতে অনেকে আসিয়া অতিথি হয়, আপনি সেই বাড়ীতে গেলে মহাসুখে থাকিতে পারেন।"

যুবক কৃষকদিগের কথায় নির্ভর করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামটী প্রাচীন, মধ্যে মধ্যে পুষ্করিণী, চারিদিক বনাচ্ছন্ন; কোন দিক দিয়া কোথায় যাইতে হয় কিছুরই ঠিকানা করা যায় না। ইতিমধ্যে সম্মুখদিকে কে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে আসিতেছে।

যুবক বলিলেন, "কে ও?"

সমাগত ব্যক্তি কহিল, "এ যে অপরিচিত স্বর শুনিতেছি, মহাশয়ের নিবাস কোথা?"

যুবক। মহাশয়! নিবাস বহু দূরে, সম্প্রতি মুকুন্দ ঠাকুরের বাড়ী যাইব, আমায় অনুগ্রহ করিয়া পথটী দেখাইয়া দিন্।

সমাগত ব্যক্তি যুবককে পথ দেখাইয়া দিয়া কহিল, "ঐ যে মুকুন্দ ঠাকুরের বাড়ীর প্রদীপ দেখা যাইতেছে; মহাশয়! আপনার নামটী কি জানিতে ইচ্ছা করি।"

যুবক কহিলেন, "বলিতে কোন বাধা নাই; আর বিশেষ আপনি যে উপকার করিলেন, আমার নাম উমানাথ ভট্টাচার্য্য।"

পথ প্রদর্শক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এস্থানে কি নিমিত্তে আসিয়াছেন?"

উমানাথ। অতিথি হইবার নিমিত্ত। এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

মুকুন্দ ঠাকুরের বাড়ীতে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের আরতি হইতেছে। মুকুন্দ নিজে বিষ্ণুমন্ত্র উপাসক এবং বাস্তবিকই এক জন পরম বৈষ্ণব, অতিথির প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা। উমানাথ উপস্থিত হইবামাত্র মুকুন্দ কায়মনোবাক্যে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

উমানাথ সেই সামান্য পল্লীতে, পর্ণকুটীরের শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। চারিদিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, এবং পবিত্রতাময়; বিগ্রহের সম্মুখে মনোহর পুষ্পোদ্যান নৈশ সমীরণ সহকারে শ্রান্ত অতিথিদিগকে সৌরভ বিতরণ করিতেছে। উদ্যানের মধ্যে অতি সুন্দর পরিস্কৃত স্থানে বৈষ্ণবেরা খোল করতাল লইয়া সংকীর্ত্তনের আয়োজন করিতেছে। শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হইতেছে।

উমানাথ কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিলেন্, পথশ্রমে তাঁহার সাতিশয় ক্লান্তি বোধ হইয়া-

ছিল, সুতরাং তিনি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ক্রমে সঙ্গীত নিবৃত্ত হইল, গায়ক বাদকেরা যথাসাধ্য শ্যাম-সুন্দরের গুণ কীর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করিল। শ্রোতৃগণ পরিতৃপ্ত অন্তঃকরণে ফিরিয়া গেল। রাত্রি নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। পূর্ণ শশধর স্বীয় সুধাময় কিরণনিচয়ে নীরবে ধরাতল বিধৌত করিতে লাগিলেন।

নিশীথ সময়ে উমানাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্টা একটী ষোড়শী যুবতী তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। যুবতীর মুখশ্রী গম্ভীর, বক্ষোপরি বিলম্বিত কেশ পাশ, নয়নে চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই। উমানাথ মনে করিলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আমি অপরিচিত ব্যক্তি, আমার পার্শ্বে এই সময়ে একাকিনী যুবতীর অবস্থান কি প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে? তিনি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে!"

যুবতী উত্তর করিলেন, "আপনি পথ শ্রান্ত অতিথি, ভয়ানক গ্রীষ্মে ছট্ ফট্ করিতেছিলেন, তাই আপনাকে একটু বাতাস করিতেছিলাম; এখন ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, আপনি ঘুমুন, আমি যাই।"

এই বলিয়া যুবতী গাত্রোত্থান করিলেন। উমানাথ তাঁহার রূপে, ততোধিক তাঁহার সদয় আচরণে এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াও বলিতে পারিলেন না; কেবল সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ভাবাভাবৌ হৃদয় নিলয়ে,
কোঽবগন্তুম্ সমর্থঃ।

সুরেন্দ্র বাড়ী আসিয়াছেন, তাঁহার মাতা মাসাবধি পুত্রের মুখ না দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন, আহারে প্রবৃত্তি ছিল না, রাত্রিতে নিদ্রা ছিল না, কিন্তু আজি প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়াছে; একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্র বিদেশ হইতে বাটী আসিয়াছে।

সুরেন্দ্র অনেক টাকা আনিয়াছেন; তাঁহার পিতা দূর দেশে জমীদারী কার্য্য করিতেন, তথায় তিনি কতকগুলি ভূসম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন; সুরেন্দ্রের বার বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু তাহাতে বিধবা বা নাবালকের যে বিশেষ কষ্ট হয় নাই, সে কেবল সেই ভূ-সম্পত্তির গুণে; বিশেষ তদ্বির পূর্ব্বক আনিতে পারিলে, বার্ষিক তিন হাজার টাকার ভাবনা নাই।

অনেক দিন যাবৎ সুরেন্দ্রের বিবাহের কথা হইতেছে, কেবল বিষয় সম্বন্ধীয় বিবিধ গোলযোগে, তাঁহার মাতা তদ্বিষয়ে সাহসিনী হইতে পারেন নাই; সরিকের সহিত মোকদ্দমাও বিস্তর করিতে হইয়াছে, তাহাতে প্রচুর অর্থব্যয় ও অনেক প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া এই স্থির হইয়াছে, যে সম্পত্তিতে সুরেন্দ্রের পিতৃব্যের কোন অংশ নাই।

সুরেন্দ্রের মাতা তাঁহার বিবাহের জন্য যত উদ্যোগিনী হইতে লাগিলেন, সুরেন্দ্র ততই তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন।

অথচ মা দুঃখিত না হন, এই জন্য বলিলেন, "মা, এতদিন নানা প্রকার বৈষয়িক গোলযোগে আমার পড়ায় অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে, আমি আরও কিছুদিন পড়িতে ইচ্ছা করিতেছি; আর দুই তিন বৎসর পড়িলেই আমি শেষ পরীক্ষা দিতে পারি; কিন্তু এক্ষণে বিবাহ করিতে গেলে, হয়ত ততদূর আর হইয়া উঠিবে না।"

মাতা সম্মত হইলেন, সুরেন্দ্র কয়েকদিন বাটী থাকিয়া, কলিকাতা যাত্রা করিলেন। যে স্থানে তাঁহার বাটী, তথা হইতে একদিনের পথ হাঁটিয়া না আসিলে রেল পাওয়া যায় না; তিনি প্রত্যূষে বাটী হইতে রওনা হইয়া, স্নানের সময় যে স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানে রাস্তার অব্যবহিত দক্ষিণ পার্শ্বে একটী সুন্দর সরোবর; তাহার তীরে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ বিস্তৃত ছায়া এবং সুস্নিগ্ধ বাতাস বিতরণ করিতেছিল; স্থানটী অতি মনোরম, রবিকরতাপিত ক্লান্ত পথিকেরা এই স্থানে মহাসুখে ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে।

সুরেন্দ্র তথায় বসিলেন, সুস্নিগ্ধ বায়ুতে তাঁহার শ্রান্তি দূর হইয়া, হৃদয়ে সেই মনোরম চিন্তার উদয় হইল। সেই হৃদয়-রঞ্জিনী, সরলা বালিকা তাঁহার চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিল। সুরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, জগতে আর কি পদার্থ আছে যাহাকে ইহার তুল্য মনে করা যায়? স্নেহলতার মুখশ্রী অতুল, হাসি অদ্বিতীয়, হাব ভাব অনির্ব্বচনীয়; জগতে এমন আর কিছুই নাই, যাহা স্নেহলতার স্থান অধিকার করিতে পারে। কিন্তু আমি আসিবার সময় স্নেহলতা আমাকে দেখা দিল না কেন? যে স্নেহলতা দর্শনাবধি আমার সহিত তেমন সদয়

ব্যবহার করিল—অশেষ প্রকারে আমার মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিল, সেই স্নেহলতা প্রস্থান সময়ে আমাকে একবার দেখা দিল না, বা একটা কথা কহিল না কেন? আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছিলাম?—না, তাহাও ত কিছু মনে পড়িতেছে না; তবে বোধ হয়, বালিকা বলিয়াই এইরূপ করিয়া থাকিবে। কিম্বা হয় ত আমার চলিয়া আসিবার কথা, স্নেহলতা পূর্ব্বে জানিত না;—জানিলেও, হয় ত আমি আসিবার সময় তাহার সে কথা মনে ছিল না। আমিও ত আসিবার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি নাই, সে জন্য আমার ন্যায় তাহারও দুঃখ হওয়ার সম্ভব। কিন্তু আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই কিসের জন্য?

সুরেন্দ্র এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে একটী লোক নিকটবর্ত্তী পল্লী হইতে সেই সরোবরে স্নান করিতে আসিলেন। লোকটী প্রাচীন,—দেখিতে ভদ্রলোকের মত; তিনি সুরেন্দ্রকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেন্দ্র পরিচয় দিলে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাটীতে আনিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা কারলেন।

তিনি আপনা হইতেই কহিলেন, "বৎস! তোমার পিতা আমার বন্ধু ছিলেন; আমরা এক সঙ্গে চাকরী করিতাম, চাকরীস্থলেই তাঁহার কাল হয়; তখন তুমি নিতান্ত বালক, আমাকে দেখিয়াছ, কিন্তু তোমার মনে নাই, পরিচয় না দিলে আমিও তোমার চেহারা দেখিয়া কোনমতে চিনিতে পারিতাম না। মৃত্যুকালে আমিই তোমার পিতার নিকটে ছিলাম; তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, 'যে ভূ-সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেছি, তাহাতে আমার বিধবা স্ত্রী ও বালকের কোন কষ্ট হইবে না।

তবে ইহা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাইতে পারে, এমত সাহায্য করিও, আর দেখিও ছেলেটীর যেন বিদ্যাভ্যাস হয়, এবং উপযুক্ত সময়ে বিবাহ হয়।' তিনি এই সকল ভার দিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি এমন দুর্ভাগ্য, যে এতাবৎ কালের মধ্যে একদিনের জন্যও তোমাদিগের তত্ত্বাবধান লইতে পারি নাই। তোমার পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পরেই এক জালিয়তি মোকদ্দমায় পড়িয়া আমার দশ বৎসর কারাবাস হয়। আমি সেই অধধি কারাবাসেই ছিলাম, দুই বৎসর হইল দেশে আসিয়াছি।

"আমার দেশে থাকিবার ইচ্ছা নাই; কেবল এই বালিকাটীর জন্যই আসিয়াছি এবং বোধ হয় আরও কিছুদিন থাকিব। ইহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে পারিলেই ৺কাশীধামে চলিয়া যাই. আমি এই জন্য তোমার মার সঙ্গে দেখা করিব মনে করিয়াছি।"

সুরেন্দ্র তাহাতে কোন কথা কহিলেন না, প্রাচীন পিতৃবন্ধুর চরণে প্রণত হইয়া গমনোন্মুখ হইলেন। বৃদ্ধ সে দিবস তথায় অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, আমি নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃই থাকিতে পারিলাম না, বাটী যাইবার সময় পুনরায় শ্রীচরণ দর্শন করিয়া যাইব।" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং
যদ্বিধের্ম্মনসি স্থিতং।

পর দিবস বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় রেলওয়ে ষ্টেসনে উমানাথের সহিত সুরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। সুরেন্দ্র উমানাথের বিদেশ ভ্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, উমানাথ কহিলেন, "ভাই! গৃহে আর ভাল লাগে না, তাই বাহির হইয়াছি; কলেজ ছাড়িয়া অবধি একদিনের জন্যও চিত্তে সুখ নাই। অনেকে চাকরী পায় না বলিয়া মনোদুঃখে কালক্ষেপ করে, কিন্তু আমার পক্ষে সেরূপ নহে, আমি কলেজ ছাড়িয়াই উত্তম চাকরী পাইয়াছিলাম, কিন্তু এক মাসের অতিরিক্ত কাল তাহা করিতে পারি নাই; চিত্তে নিয়তই অশান্তি।"

সুরেন্দ্র কহিলেন, "ভাই! মনোমত দ্রব্যের অভাব হইলেই অন্তঃকরণে অশান্তির উদ্রেক হয়, তোমার প্রাণে যাহা চায়, তাহা পাইলে তুমি আর কেন ব্যাকুল হইবে? কিন্তু ঈশ্বরই তাহা মিলাইতে পারেন। তুমি এখন আমার সহিত কলিকাতা যাইবে?"

উমানাথ কহিলেন, "কলিকাতা কেঁন, তুমি আমাকে যেখানে যাইতে বল, সেইখানেই যাইতে পারি; আমার বোধ হয়, তোমার সঙ্গে থাকিলে আমার অন্তঃকরণে অনেক শান্তি জন্মে। আমি সংপ্রতি দুর্গাপুরে যাইতেছি।"

দুর্গাপুরের নাম শুনিয়া সুরেন্দ্রের বুকের মধ্যে দুড় দুড় করিয়া উঠিল! এই দুর্গাপুরেই তিনি হৃদয়-রঞ্জিনী স্নেহলতাকে রাখিয়া আসিয়াছেন। সুরেন্দ্র কহিলেন, "কোন্ দুর্গাপুরে?—যেখানে জমীদার দুর্গাদাসবাবুর বাড়ী?"

উমা। হাঁ।

সুরেন্দ্র। সেখানে কেন?

উমা। দুর্গাদাসবাবুর কন্যার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। পিতামাতার একান্ত ইচ্ছা সেই বিবাহই হয়; কিন্তু স্বচক্ষে না দেখিয়া বিবাহ করিব না বলায়, উভয় পক্ষ হইতেই দেখিবার অনুমতি পাইয়াছি, তাই একবার দুর্গাপুরে যাইতেছি।

সুরেন্দ্র অন্তরে অন্তরে হতাশ হইলেন। এ দুঃখ জানাইবার আর স্থান নাই। যদি দুর্গাদাসবাবু উমানাথের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তবে তিনি কি করিতে পারেন? তিনি উমানাথের কর গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! শুনিয়া সুখী হইলাম; শুনিয়াছি, দুর্গাদাসবাবুর কন্যাটী পরমা সুন্দরী; সে তোমার সহিত কেমন আলাপ করে, আমাকে পত্রে লিখিয়া জানাইও, আর কবে তোমার বিবাহ হইবে তাহাও যেন জানিতে পাই। যদি পারি, আসিয়া তোমাদের বিবাহও দেখিব।"

বলিতে বলিতে ট্রেন আসিয়া পড়িল, সুরেন্দ্র উমানাথের কর মর্দ্দন করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। উমানাথ 'তা অবশ্য লিখিব, অবশ্য জানাইব' বলিয়া বিদায় হইলেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া সুরেন্দ্র সমপাঠী বালকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুরেন্দ্রের সমাগমে সকলেই যারপর নাই খুসী হইলেন, অনেকে তাঁহার নিকট উমানাথের কথা জিজ্ঞাসা করি-

লেন; এবং উমানাথের মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্র কহিলেন, "যদি দুর্গাদাস-বাবুর কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়,—বোধ হয় নিশ্চয়ই হইবে, তাহা হইলে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইতে পারে, কারণ আমি জানি, মেয়েটী পরম রূপবতী এবং সকলেরই মানস-রঞ্জিনী; কিন্তু তাহাতেও যদি উমানাথের মনে শান্তি না জন্মে, তবে জানি না, চঞ্চলপ্রকৃতি উমানাথের অদৃষ্টে কি ঘটিবে।"

সুরেন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন, এবং রীতিমত লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যৌবন-সুলভ প্রণয় অঙ্কুরিত হইল বটে, কিন্তু তিনি কিছুতেই অধীর হইলেন না। তিনি নিশ্চিয়ই জানিতেন, ভালবাসা জীবনের একটী উপাদেয় উপকরণ বটে; কিন্তু বিদ্যা যশ ও ধন ইহার কিছুই উপেক্ষণীয় নহে। বিদ্যার অভাব হইলে লোকসমাজে হেয় হইয়া থাকিতে হয়; যশ না হইলে চিত্তের প্রসাদ জন্মে না, এবং যেরূপ দিন-কাল পড়িয়াছে, ধনোপার্জ্জন ব্যতীত একদণ্ডের জন্যও কোন কর্ম্ম চলে না; সুতরাং তিনি ইহার কাহাকেও তুচ্ছ করিতেন না; অথচ প্রণয়ে তাঁহার মন ছিল, তিনি ভালবাসিতে জানি-তেন। বস্তুতঃ, একজনের প্রতি সম্পূর্ণ ভালবাসাও পড়িয়াছে। তিনি মনে করিলেন, উমানাথের পত্র পাইলে যাহা হয় একটা বুঝিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ভাগ্যেন দৃষ্টা শুভলক্ষণ যা,
হা হা গতা সা কমলাননা মে।

সুরেন্দ্রের পিতৃবন্ধু বলরাম কন্যার বিবাহের জন্য সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বারুণীর বয়ঃক্রম প্রায় ষোল বৎসর হইল; তাঁহার আশা ছিল, কন্যাটী সুরেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া কাশী যাইবেন; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না; সুরেন্দ্রের তদ্বিষয়ে মত নাই; মত নাই কেন, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। বারুণীর মত সুন্দরী কন্যা সচরাচর নয়নগোচর হয় না; বারুণীর অন্তঃকরণে অসীম দয়া, মনও যার পর নাই সরল, কথাগুলি যেন মধুমাখা; এ সকল গুণ থাকিলেও সুরেন্দ্র কি জন্য তাহার পাণিগ্রহণে অনিচ্ছুক হইলেন, কেহই তাহার অনুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। বলরাম অগত্যা পাত্রান্তর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত মুকুন্দ ঠাকুর বলরামের সহোদর; বৈষ্ণব মুকুন্দ পৈতৃক স্থান পরিত্যাগ করিয়া শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতেছেন; জ্যেষ্ঠের কারাবাসের পর দশবৎসর যাবৎ তদীয় পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। মুকুন্দ ঠাকুরের পুত্রসন্তান নাই, মধ্যে মধ্যে বারুণীকে আনিয়া অপত্য-স্নেহের পরিচয় দিয়া থাকেন; তাই সে দিন নিশীথ সময়ে উমানাথ শয্যার পার্শ্বে ব্যজনকারিণী যুবতীর দর্শন পাইয়াছিলেন।

বলরাম ভ্রাতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিমর্ষ ও চিন্তান্বিত মুখ-মণ্ডল দেখিয়া মুকুন্দ বলিলেন, "দাদা, আর চিন্তা কি? বারুণীর বর ঠিক্ করিয়াছি।"

বলরাম আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

মুকুন্দ কহিলেন, "শ্যামসুন্দরের কৃপায় একটী বড়লোকের ছেলেই মিলিয়াছে। ছেলেটী ইংরাজীতে পাশ, এবং দেখিতে শুনিতেও মন্দ নয়।"

বলরাম কনিষ্ঠের কথায় বড় আস্থা প্রকাশ করিলেন না, তিনি জানিতেন, মুকুন্দ একটু পাগলা ছাঁটের লোক; অতিশয় সরল-প্রকৃতি, বিষয়-বুদ্ধি-বর্জ্জিত এবং সম্ভবা-সম্ভব-জ্ঞানশূন্য; তাই কহিলেন, "ভাই! বারুণীর বয়স এই ষোল বৎসর হইল, এখন আর কাঁচা কথার কর্ম্ম নহে; যদি সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাক চল, আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই, পত্রাপত্র করিয়া আসা যাউক।"

মুকুন্দ কহিলেন, "শ্যামসুন্দর থাকিতে আর কোথাও যাইতে হইবে না; যাহাকে আমাদের প্রয়োজন, তাহাকে এই স্থানে বসিয়াই পাওয়া যাইবে। সে দিন সে বর এইখানে আসিয়া বারুণীকে দেখিয়া গিয়াছে।"

এ কথা বলরামের ভাল লাগিল না; তিনি মুকুন্দের প্রতি বিরক্ত হইলেন; কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া নিতান্ত চিন্তান্বিত অবস্থায় কালক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী যুবক আসিয়া তথায় আতিথ্য স্বীকার করিলেন। মুকুন্দ দেখিবামাত্র তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক বসিতে দিলেন; এবং যথোচিত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

 RARE

পাঠক! এই যুবককে বোধ হয় চিনিতে পারেন নাই? ইনি উমানাথ; দুর্গাপুর হইতে বাটী ফিরিয়া যাইতেছেন, দুর্গাপুরের কথা আমরা সুরেন্দ্রের নিকট প্রেরিত পত্রে দেখিতে পাইব। এক্ষণ এ স্থানে আতিথ্য গ্রহণের কারণ অন্বেষণ করা যাউক।

আজিও ভয়ানক গ্রীষ্ম, রাত্রিও সেইরূপ চন্দ্রালোকে বিধৌত, প্রকৃতিও নিস্তব্ধ। নিশীথকাল, উমানাথ জাগ্রত-নিদ্রায় অভিভূত; কৈ, সে ব্যজনকারিণী কোথায়? সে দিন বিনা আয়াসে যে মহার্ঘ্য রত্নের সন্দর্শন হইল, আজি প্রতি নিশ্বাসে আবাহন করিয়াও তাহাকে পাওয়া যায় না। সে দয়ার সাগর কি দুদিনেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে?

উমানাথের রাত্রিতে নিদ্রা হইল না, কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারেন না। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখেন, কোথায়ও সেরূপ কিছুই দেখা যায় না; কি করেন, পূর্ব্বের ঘটনা তাঁহার চক্ষে এত বাস্তব বলিয়া বোধ হইয়াছিল, যে তাহা কোনক্রমে নিশীথস্বপ্নেও পর্য্যবসিত হয় না। নিকটে একটী বৃদ্ধাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ঠাকুর মহাশয়ের ছেলেরা কোথায়?"

বৃদ্ধা। এই ঠাকুর মহাশয়ের কি ছেলে আছে?—ছেলে মেয়ে কিছুই নাই।

সংশয় আরও বাড়িল, উমানাথ মনে করিলেন, ব্যজনকারিণী কোন প্রতিবেশীর কন্যা হইবে।

উমানাথ সে দিবস তথায় রহিলেন, অতিথি হইয়া কয়েক দিন পড়িয়া থাকা ভাল দেখায় না বিবেচনা করিয়া, তিনি মুকু-

B891.443 A7199

ন্দকে কহিলেন, "প্রভো! এই স্থানটী অতি মনোরম, অনুমতি করুন আমি নিকটে কোথায়ও বাসা লইয়া নিত্য এই সংকীর্ত্তন শ্রবণে আত্মাকে চরিতার্থ করি।"

মুকুন্দ কহিলেন, "বৎস! সাধু সাধু, যত দিন ইচ্ছা এই স্থানে অবস্থান কর, এ তোমারই বাড়ী; আমিই অতিথি, আমিই আগন্তুক।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সন্তপ্তমানসানান্ত,
শান্তির্বিরামদায়িনী।

সুরেন্দ্র ডাকের পত্র খুলিয়া পড়িতেছেন, "ভাই সুরেন। অদ্য বেলা এক প্রহরের সময় দুর্গাপুরে পৌছিয়া একটী পরিচিত লোকের বাটীতে আহারাদি করিয়াছি। বৈকালে দুর্গাদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তিনি আমাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমি তাঁহার অনুমতিক্রমে অন্দরে যাইয়া উপবেশন করিলে, স্নেহলতা আমার সম্মুখে আনীত হইল, আমি স্নেহলতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কি পড় ?' স্নেহলতা লজ্জায় অধোবদনে রহিল, কোন কথা কহিল না। আমি পুনঃপুনঃ অনুরোধ করাতে সে কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের নাম করিল। কিন্তু সে ক্রমশঃই লজ্জায় এত জড় সড় হইতে লাগিল যে, আমি আর তাহাকে অধিক উত্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিলাম না।

"এক্ষণে মনের কথা বলি, দুর্গাদাস বাবুর কন্যাটী আমার চক্ষে ভাল লাগিয়াছে; এমন সুন্দর মুখশ্রী, সুঠাম গঠন, রমণীর মূর্ত্তি আমি আর কখনও দেখি নাই। আমি এই বিবাহই স্থির করিলাম। পর পত্রে তোমাকে বিবাহের দিন স্থির করিয়া লিখিতেছি।"

পত্র পড়িয়া সুরেন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। উমানাথের সহিত স্নেহলতার বিবাহ হয়, হউক, তাহাতে তিনি

কুণ্ঠিত হইয়া কি করিবেন ; কিন্তু তাঁহার মনে এই কষ্ট যে, যে কথা তাঁহার মনে শত সহস্রবার উদিত হইতেছে, সে কথা কি আর কাহারও মনে একবারও উদিত হয় না ? দুর্গাদাস, তাঁহার স্ত্রী অথবা কোন প্রতিবেশী, কেহই কি এমন কথা বলেন না, যে সুরেন্দ্রের সঙ্গে স্নেহলতার বিবাহ হইলে দোষ কি ? স্নেহলতাও কি একথা একবার ভাবে না ? যদি স্নেহলতার মনে সুরেন্দ্রের কথা না উঠে, তবে সুরেন্দ্র এতদিন যত ভাবিয়াছেন, সমস্তই মুছিয়া ফেলিতে পারেন, নচেৎ তিনি কোন ক্রমেই স্নেহলতার কথা ভুলিতে পারিবেন না।

সুরেন্দ্র অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিপিন বাবুর নিকট একখানি পত্র লিখিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু কি লিখিবেন, কি বলিয়া আরম্ভ করিবেন, কি বলিয়াই বা শেষ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সেদিন দুই তিনখানি পত্র লিখিলেন,—লিখিয়া আবার ছিঁড়িলেন। একখানিও ঠিক হইল না। সমস্ত রাত্রি চিন্তায় চিন্তায় অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রভাতে লিখিলেন,—"প্রিয় বিপিন বাবু! অনেক দিন আপনাদিগের সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই। আপনারা কেমন আছেন, স্নেহলতার বিবাহের কি হইতেছে, এসকল জানিতে ইচ্ছা করি। আমি এস্থানে আসিয়া অবধি নানাবিধ চিন্তায় কালযাপন করিতেছি, এজন্য আপনদিগের নিকট পত্রাদি লিখিতে পারি নাই, তজ্জন্য আপনারা দুঃখিত হইবেন না।

"যে সময়ে আমি স্নেহলতাকে প্রথম দেখি, সেই সময় হইতেই তাহার প্রতি আমার সাতিশয় স্নেহ ও মমতা জন্মিয়াছে। স্নেহলতা সৎপাত্রে ন্যস্তা হয়, ইহাই দেখিবার জন্য

আমার চিত্ত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমি স্নেহলতার মত সর্ব্বগুণসম্পন্না বালিকা আর দেখি নাই; যাহাতে সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বরের হস্তে অর্পিত হয়, আপনারা তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা মনোযোগী হইবেন। স্নেহলতার বিবাহের দিন ধার্য্য হইলে আমাকে জানাইবেন, আমি বিবাহ দেখিতে যাইব।

"বিপিন বাবু, আপনার নিকট আমার আর একটী মিনতি আছে, যেখানেই স্নেহলতার বিবাহের সম্বন্ধ হউক না কেন, আপনি তাহার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া, পাকা করিবেন না। যদিও সে বালিকা এবং এ সম্বন্ধে তাহার মত গ্রহণ অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তথাপি অন্ততঃ আমার অনুরোধেও আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, বা তাহার কোন সঙ্গিনী দ্বারা জিজ্ঞাসা করাইবেন; ইহার অন্যথা হইলে, আমি যদি জন্মের মত শান্তিতে বঞ্চিত হই, এই আমার ভয়।"

সুরেন্দ্র এইরূপে পত্র সমাধা করিয়া—বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে পত্রখানি দুই তিন বার পড়িয়া ডাকে প্রেরণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিরাজিতা হীরকসারনির্ম্মিতৈঃ
সা এব দৃষ্টা বিবিধৈর্বিভূষণৈঃ।

মুকুন্দের বাটীতে তিন দিবস অতিবাহিত হইল, তথাপি উমানাথের অদৃষ্টে দ্বিতীয়বার সে নিশীথস্বপ্ন জুটিল না। উমানাথ যদি স্নেহলতার প্রতি প্রকৃতই অনুরাগী হইতেন, তাহা হইলে তিনি মুকুন্দের বাটীতে আর যাইতেন না; যদিও যাইতেন, তথাপি আর সে নিশীথ-স্বপ্নের প্রত্যাশা করিতেন না; যদি বা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া করিতেন, তাহা হইলে কদাচ ক্রমান্বয়ে তিন দিবস অতিবাহিত করিতেন না।

পরদিন প্রভাতে উমানাথ বাটী যাত্রা করিলেন। যে মুকুন্দ তাঁহাকে এত যত্ন করিতেছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাটী যাইবার সময় তাঁহাকে একবার বলিয়াও গেলেন না। মুকুন্দ শ্যামসুন্দরের পূজার জন্য ফুল তুলিতে গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখিলেন, অতিথি চলিয়া গিয়াছে। দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, তাঁহার সদানন্দ চিত্ত ক্ষণকালের নিমিত্ত শোকসাগরে নিমগ্ন হইল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রাস্তার ধারে অশ্বথমূলে একখানি পাল্কী আসিয়া নামিল। পাল্কীর সহিত একটী বৃদ্ধ লোক রবিকর-সন্তপ্ত মুখে ধীরে ধীরে সেইখানে আসিয়া বসিলেন। উমানাথ পূর্ব্বেই অশ্বথমূলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। বৃদ্ধ তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

চঞ্চল-প্রকৃতি উমানাথ যার তার কাছে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন; কষ্টে স্পষ্টে বলিলেন, "মহাশয়! আমার নিবাস অনেক দূরে, সংপ্রতি পথিক বলিয়াই জানিবেন।"

বৃদ্ধ দেখিলেন, যুবকটী নিতান্ত আধুনিক সম্প্রদায়ের লোক। তিনি আলাপে ক্ষান্ত হইয়া পাল্কীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মা! একবার বাহির হইয়া এইখানে স্নান করিয়া লও।"

বারুণী বাহির হইলেন,—স্বীয় অপূর্ব্ব রূপমাধুরীতে সমীপবর্ত্তী যুবককে স্তম্ভিত করিয়া বাহির হইলেন। কিবা গম্ভীর মুখশ্রী, কি সুনীল চক্ষু, কি সুন্দর নাসিকা, কি নবীন বয়স, কি সুদীর্ঘ কেশপাশ, কি প্রশান্তমূর্ত্তি! যুবক ভাবিলেন, "আমি স্নেহলতার রূপের প্রশংসা করিতেছিলাম, কিন্তু এই বালিকাটী স্নেহলতা অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী। স্নেহলতা এখনও বালিকা, কিন্তু ইনি আর বালিকা নহেন, নবযৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি আর ইঁহার দিকে চাহিব না, ইনি নিশ্চয়ই পরিণীতা হইয়াছেন।" এই ভাবিয়া যুবক অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

বারুণী স্নান করিতেছেন;—সেই অলৌকিক পবিত্রতাময় সোণার অঙ্গ ডুবাইয়া প্রান্তরের ক্ষুদ্র জলাশয়কে পবিত্র করিতেছেন; ঈষৎ তরঙ্গায়িত সরোবরে দোলায়মান ফুল্ল কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যুবক তৎপ্রতি ফিরিয়াও চাহিতেছেন না। কারণ, বারুণী যদি কাহারও পত্নী হইয়া থাকেন, তবে যুবক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আত্মাকে কলুষিত করিবেন কেন?

বারুণী স্নান করিয়া যুবকের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অলক্ত-রঞ্জিত পদযুগল সহসা যুবকের চক্ষে পতিত হওয়াতে তিনি সতর্ক হইলেন, আর দেখিলেন না। বারুণী বৃদ্ধ পিতার সম্মুখে আসিয়া বসন্ত-কোকিলের স্বরে কি কহিলেন। পাছে পরস্ত্রীর সুমধুর বাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, এই ভয়ে যুবক গুন্ গুন্ স্বরে গান ধরিলেন, যুবতীর বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না। বারুণী পুনরায় পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই সময়ে দুই চারিটী লোক সেই স্থানে স্নান করিতে আসিয়াছিল; তাহারা বৃদ্ধের সহিত কি কি কথোপকথন করিল, যুবক তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। কিন্তু "মথুরাপুরে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দের বাস" এই কথা যখন বৃদ্ধের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, তখন উমানাথ তাঁহার কথার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সেই লোকগুলিকে কহিলেন, "সঙ্গে আমার কন্যা, বিবাহ হয় নাই, মুকুন্দের বাটীতে বিবাহ হইবে, তাই সেইখানে যাইতেছি। সম্বন্ধ কোথায় হইয়াছে জানি না, মুকুন্দই স্থির করিয়াছে; ছেলে নাকি ইংরাজীতে খুব লায়েক এবং অবস্থাও ভাল।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ পাল্কীর সহিত প্রস্থান করিলে, উমানাথের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "বালিকাটী অবিবাহিতা জানিলে, উহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরী হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতাম। যাহা দেখিয়াছি, তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ মূর্ত্তি চিত্রিত করা অসম্ভব, তথাপি স্নেহলতাকে আর হৃদয়ে স্থান দিতে পারিতেছি না। আমি স্নেহলতাকে বিবাহ করিব

না, তবে সুরেন আমাকে ছেলে মানুষ বলিবে, তা বলুক; আমি আজি হইতে বারুণীর ধ্যানে নিযুক্ত হইলাম।”

কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তায় আকুল থাকিয়া উমানাথ আবার ভাবিলেন, “তাহাতেই বা ফল কি? আজি বারুণী কাহারও স্ত্রী নহে সত্য, কিন্তু কালি ত এক জনের অঙ্কলক্ষ্মী হইবে। তখন তাহার কথা ভাবিবার আমার কি অধিকার থাকিবে? তবে কি আজি তাহার মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, কালি আবার তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে? এইরূপ চিন্তায় উমানাথের হৃদয় উৎপীড়িত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, পরে আবার কহিলেন, “আহা! যাহা দেখিলাম, এ জীবনে কদাচ তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমি সে মোহিনী-মূর্ত্তি আজীবন মনোমন্দিরে রাখিয়া পূজা করিব। পরপাণি-গৃহীত বারুণীর কথা আমি ভাবি না। এইখানে এই অশ্বত্থ-মূলে যে প্রফুল্ল পদ্ম-বিনিন্দিত মুখমাধুরিমা নয়নগোচর করিয়াছি, আমি তাহাই ভাবিব; এই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জলে যে মনোরম লাবণ্যরাশি স্নানচ্ছলে বিধৌত হইয়াছিল, আমি সেই লাবণ্যের কথা ভাবিব। বারুণী আমার কে? কিন্তু এই স্থানে আমার উন্মুখ চক্ষু যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াছে, তাহা আমার, আমি তাহা হৃদয়ে রাখিয়া পোষণ করিব। তদপেক্ষা মহত্তর কোন পদার্থ জগতে যে আর আছে, আমার এমন বোধ হয় না; থাকিলেও তৎপ্রতি আমার নয়ন আজি অবধি প্রকৃতই অন্ধ হইল।”

নবম পরিচ্ছেদ।

BHOWANIPUR VEENA LIBRARY
K. B. ROY
SOLE PROPRIETOR
1896

ন জানে পরমাদ্ভুতং,
কিমস্তা হৃদি বর্ত্ততে।

বিপিন বাবু কে? এতক্ষণ দুই তিনবার বিপিনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার পরিচয় দিবার সময় হয় নাই। দুর্গাপুরে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে; বিপিন বাবু সেই বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক; বাল্যকাল হইতেই দুর্গাদাস বাবুর অন্নে প্রতিপালিত। তাঁহার পিতা দুর্গাদাস বাবুর দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর নিরাশ্রয় দেখিয়া, দুর্গাদাস বাবু বিপিনকে পুত্রের মত স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। বিপিনও দুর্গাদাস বাবুকে পিতার ন্যায় মান্য করেন এবং তাঁহার পুত্র-কন্যা-গুলিকে স্বীয় সহোদর-সহোদরার ন্যায় ভালবাসেন। স্নেহলতাকে তিনিই স্বহস্তে মানুষ করিয়াছেন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে লেখা পড়াও শিখাইয়াছেন। স্নেহলতার প্রতি তাঁহার অপরিসীম মমতা।

বিপিন সুরেন্দ্রের পত্র পাইয়া মনোযোগের সহিত তাহা দুই তিনবার পড়িলেন। পত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম তাঁহার হৃদগত হইল বটে, কিন্তু তিনি কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ না করিয়া দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে ভাবিলেন, "তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি? উমানাথের পিতা পত্র লিখিয়াছেন, উমানাথ দুর্গাপুরে বিবাহ করিতে চাহেন

না। অনেক দিনের নির্দ্ধারিত সম্বন্ধ, বরও কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিয়াছিল, এমন কার্য্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আবার কোথায় সম্বন্ধ স্থির হইবে, সে এখন অনেক দিনের কথা। এই জন্য তাড়াতাড়ি নাই।”

বিপিন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন এবং লিখিয়া দিলেন, “আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় জানিবার সুবিধা হয় নাই, যদি কোন-ক্রমে জানিতে পারি, আপনাকে অবিলম্বে পত্র লিখিব।”

বিপিনের এখন একমাত্র চিন্তা, কি করিয়া এ কথা জানি-বেন। কেবল যে সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে, স্নেহলতার মত লইতে হইবে, এমন নহে। বিপিন বিবেচনা করিলেন, যে কন্যার বিবাহ হইবে, তাহার যদি নিজ মত প্রকাশের উপযুক্ত সময় হইয়া থাকে, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বর স্থির করাই কর্ত্তব্য। এ কথা বিপিন পূর্ব্বেও জানিতেন, কিন্তু সুরেন্দ্রের পত্রে তাঁহার বিবেক-শক্তি যেন অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, দেখিতে দেখিতে স্নেহলতা চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বিবাহ হইলে কোন কথাই ছিল না; কিন্তু এক্ষণে বিবাহ কি, স্বামী কি পদার্থ, ইহা তাহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্য করা বিধিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমরা কেবল বড় ঘর ও পাশ করা ছেলেই খুঁজিতেছি; কিন্তু স্বামী ধনী ও বিদ্বান্ হইলেই যে রমণীদিগের সুখের ঘর হয় এমত নহে। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে, অতুল ঐশ্বর্য্যশালীর হস্তে পড়িয়াও মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদিগের অশ্রুপাতের বিরাম নাই। আবার দরিদ্রের ঘরেও, তাহারা মনের সুখে কালযাপন করে।

বিপিন ইহাও জানিতেন যে, দুর্গাদাস বাবুর সংসারে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা; স্নেহলতার বিবাহ সম্বন্ধে তিনি যাহা করিবেন তাহাই মঞ্জুর; কেবল বিবাহ কেন, জমীদারীর অনেক গুরুতর কার্য্যও বিপিনের এক কথায় মীমাংসা হইয়া যায়; অথচ বিপিনের বয়স দ্বাবিংশ বৎসরের অধিক নহে; বিদ্যাও তত বেশী নাই; কেবল অসাধারণ বুদ্ধি, অকৃত্রিম শীলতা, অপরিমিত সহিষ্ণুতা এবং অকৃত্রিম নিঃস্বার্থতাগুণেই তিনি তাদৃশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। যদি স্নেহলতার বিবাহ সম্বন্ধে দুর্গাদাস বাবু বিপিনের প্রতি সম্পূর্ণ ভারার্পণ না করিতেন, তাহা হইলে বিপিন সুরেন্দ্রের পরামর্শের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে উদাসীন হইলেও হইতে পারিতেন। কিন্তু বিবাহের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার স্কন্ধে অর্পিত হওয়াতে, তিনি তাহার কিয়দংশ স্নেহলতার উপর ন্যস্ত করিতে মনন করিলেন।

তিনি একদিন নিভৃত কক্ষে স্নেহলতাকে ডাকিলেন। স্নেহলতা তাঁহার নিকট আসিলে, তিনি কহিলেন, "স্নেহলতা! আমি তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, যদি তাহার যথার্থ উত্তর দেও, তবেই প্রকাশ করি।"

স্নেহ। আগে বল।

বিপিন। আগে বলিলে যদি তুমি উত্তর না দেও।

স্নেহ। দাদা! তুমি আমায় এমন কি কথা বলিবে?

বিপিন। কত জায়গায় ত চেষ্টা করিলাম, তোমার বর কোথায়ও মিলিল না; তাই জিজ্ঞাসা করি, তোমার বর কোথায়, বলিয়া দিতে পার?

স্নেহলতা অধোবদনে বলিলেন, "তা আমি কি করিয়া জানিব!"

বিপিন। তবে একটা দিক্ স্থির করিয়া দাও, আমরা সেই দিক্ চেষ্টা করিতে যাই।

স্নেহ। তোমরা কোথায়ও যাইও না।

বিপিন। স্নেহলতা শুন, একটী বর আমার নিকট পত্র লিখিয়াছে, যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে, বল, আমি বিবাহের উদ্যোগ করি, আর বিলম্ব করা ভাল দেখায় না।

স্নেহলতা বলিলেন, "আমি যাই।" বিপিন ভাবিয়াছিলেন, স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করিবে কোথা হইতে কোন্ বর পত্র লিখিয়াছে, সে কেমন বর। কিন্তু স্নেহলতা তাহা না জিজ্ঞাসা করিয়া গমনোদ্যত হইল। বোধ হয় লজ্জা পাইয়াছে,—এই ভাবিয়া তিনি কহিলেন, "স্নেহলতা! যাইও না, আমি তোমাকে বরের পত্র দেখাইব।"

স্নেহলতা কহিলেন, "আমি দেখিব না, তুমি দেখ।"

বিপিন। আমি ত দেখিয়াছি, এখন তুমি দেখিলেই, তাহার পত্রের উত্তর দিতে পারি।

স্নেহলতা কহিলেন, "লিখিয়া দেও, স্নেহলতা মরিয়াছে।"

বিপিন। সে কথা লিখিলে, সেও মরিবে; পত্র পড়িয়া দেখ, সে তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসে।

স্নেহ। কেন, সে কে?—সে কি আমাকে দেখিয়াছে?

বিপিন। সে তোমাকে বেশ করিয়া দেখিয়াছে, তুমিও তাহাকে দেখিয়াছ।

স্নেহলতা একটু ভাবিয়া কহিলেন, "আমার ত কিছু মনে পড়ে না।"

বিপিন। মনে করিয়া দেখ, সেই ভাঙ্গা মন্দিরের সম্মুখে,— ঝড় বৃষ্টির দিনে।—

স্নেহ। ওঃ—বুঝিতে পারিয়াছি।

বিপিন। এখন তাহার পত্রের কি উত্তর দেওয়া যায়?

স্নেহ। তা' আমি জানি না।

বিপিন। তাহাকে আসিতে লিখিব?

স্নেহ। কেন?

বিপিন। ভাল করিয়া দেখা শুনা হইবে।

স্নেহ। না।

বিপিন। দেখা শুনা হইতে দোষ কি? তোমার ইচ্ছা হয়, বিবাহ হইবে, না হয়, না হইবে।

স্নেহ। না।

বিপিন। তাহাকে কি তোমার একবার দেখিতেও ইচ্ছা হয় না?

স্নেহ। না।

স্নেহলতা সকল কথাতেই "না" কহিল দেখিয়া, বিপিন তাহাকে তৎসম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা ভাল বিবেচনা করিলেন না। তিনি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমানাথ কেমন বর?"

স্নেহলতা কহিলেন, "তা আমি জানি না।" এই বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। বিপিন আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সাহস করিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

যেষামন্যা গতির্নাস্তি,
তেষাং বারাণসী গতিঃ।

মুকুন্দঠাকুরের মুখে আজি কথা নাই, তিনি জ্যেষ্ঠকে কন্যা আনিতে পাঠাইয়াছিলেন, বর তাঁহার হাতে ছিল! বর না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি বরকে কোন কথা ভাঙ্গিয়া বলেন নাই। তাঁহার মনে মনে এই ধারণা ছিল, শ্যামসুন্দরই বরকে রাখিয়া দিবেন। বলরাম কহিলেন, "মুকুন্দ! তুই সকল বিষয়েই পাগ্‌লাম করিস্।"

মুকুন্দ কোন কথা কহিলেন না, কি বলিবেন, শ্যামসুন্দরের প্রতি কার্য্যের ভার ছিল, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া কহিলেন, "দাদা! সকলই শ্যামসুন্দরের ইচ্ছা। যাহা হউক, আপনি আর তজ্জন্য ভাবিবেন না, আমিই বারুণীর বিবাহের ভার গ্রহণ করিলাম, আপনি কাশী যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, স্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন; আমি অঙ্গীকার করিতেছি বারুণীকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে অর্পণ করিব।"

বলরাম তাহাতে সম্মত হইলেন। বলরাম মুকুন্দকে একটু পাগ্‌লাটে মনে করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবত্তা, অমায়িকতা ও স্নেহমমতার প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও অসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার কারাবাস-সময়ে মুকুন্দ প্রাণপণে বারুণীকে প্রতিপালন করিয়াছেন, একদিনের জন্যও বারুণীকে পিতার অভাব জানিতে

দেন নাই; এই কথা বলরামের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। এক্ষণে সেই মুকুন্দ বারুণীর বিবাহের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া, বলরামকে কাশী যাইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন, কাজে কাজেই বলরাম আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। বলরামের কাশীবাসী হইবার ইচ্ছার বিশেষ কারণ এই যে, তিনি জানিতেন, তাঁহার সামাজিক অবস্থা ততদূর ভাল নহে; কারাবাস হইতে আসিয়া এ পর্য্যন্ত সমাজস্থ একটী ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাইতে পারেন নাই; না জানি, তাঁহার কারাবাসসূত্রে বারুণীকে হীনবংশে সম্প্রদান করিতে হয়, এ ভয়ও তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক ছিল। এই সমস্ত কারণে তিনি মুকুন্দনাথের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না।

তিনি বারুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বারুণী! তবে আমি কাশী যাই?"

বারুণীর চক্ষে জল আসিল,—কহিলেন, "বাবা! আবার কবে আসিবে?"

বল। তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না; আমি শীঘ্রই আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব।

বারুণী জানিতেন, তাঁহার পিতার কাশীবাসই শ্রেয়ঃ, কারণ তিনি সমাজচ্যুত হইয়া ছিলেন, অথচ তাঁহার এমন কোন উপায় ছিল না যে সমাজের লোককে বাধ্য করিতে পারেন। তাঁহার সামাজিক অপদস্থতা বারুণীর বক্ষে পদে পদে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইত; এবং বারুণীর বিবাহের জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া দেশে থাকিতে হইতেছে বলিয়া বারুণী সর্ব্বদাই "হতভাগিনীর জন্যই বাবা সমাজে নিদারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন" বলিয়া আক্ষেপ

করিতেন। সুতরাং যখন বলরাম বারুণীকে রাখিয়া কাশী যাইতে চাহিলেন, তখন বারুণী নিজের অদৃষ্টে কি হইবে, ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন না, বরং পিতা সমাজের কুটিলদৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইবেন, এই ভাবিয়া মনে মনে সুখিনী হইলেন। তিনি সেইজন্য পিতাকে যাইতে নিষেধ না করিয়া বলিলেন, "বাবা! আবার কবে আসিবে?"

দরদরধারে বলরামের স্নেহাশ্রুপাত হইল। তিনি মুকুন্দনাথকে ডাকিয়া, বারুণীকে তাঁহার হাতে হাতে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "ভাই! তুমিই বারুণীকে মানুষ করিয়াছ, বারুণী তোমারই! আমি তিন বৎসর বয়সে বারুণীকে ফেলিয়া গিয়াছিলাম, পুনরায় আসিয়া দেখিব এরূপ আশাও ছিল না; কিন্তু তোমার যত্নে ও স্নেহের গুণেই আবার আসিয়া দেখিলাম, ইহাতেই আমার নয়ন সার্থক হইয়াছে। এখন তোমার বারুণী তোমার কাছেই রহিল, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে।" এই বলিয়া বলরাম কাশী যাত্রা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জ্বরিতশ্চিন্তাকীটেন,
সংগোপ্য মনসি স্থিতং।

বহুদিন পরিভ্রমণের পর উমানাথ এখন বাটীতে পুনরাগত। উমানাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন লোকের পুত্র; কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ততা বশতঃ সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করিত। উমানাথ তাহা জানিয়াও কোন প্রতীকার করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

উমানাথ দুর্গাপুরে থাকিয়া সুরেন্দ্রের নিকট যে ভাবে পত্র লিখিয়াছেন, বাটী আসিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করিলেন। কি জন্য মতের পরিবর্ত্তন হইল, বন্ধুদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। বন্ধুরা তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এইমাত্র বলিলেন, "আমি যে সহসাই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি, তাহার অবশ্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ্য নহে।" বন্ধুরাও ছাড়িবার পাত্র নহেন, কারণ জানিবার জন্য অধিকতর জেদ করিতে লাগিলেন।

উমানাথ আরও সতর্ক হইলেন। বন্ধুর নিকট কোন বিষয় গোপন করিলে বন্ধুর মনে বেদনা দেওয়া হয়, উমানাথ তাহা জানিতেন না এমন নহে; কিন্তু যে বিষয় প্রকাশ করিলে বন্ধুর

নিকট অপদার্থ বলিয়া গণ্য হইতে হয়, অগত্যা তাহা তিনি গোপন করিতেই কৃতসংকল্প হইলেন।

জনৈক বন্ধু অধিকতর ব্যথিত হইলেন, তাঁহার মুখ মলিন হইল। উমানাথের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। তিনি মিনতি করিয়া কহিলেন, "বিনয়! সে কথা তুমি পরে অবশ্যই জানিতে পারিবে; কিন্তু এখন সে কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিলে আমাকে উন্মাদ বলিয়া মনে করিতে পার, এই ভয়ে আমি সে কথা গোপন করিলাম, ইহাতে তুমি দুঃখিত হইও না।"

বিনয় বিদায় হইলে, উমানাথ বাটীর সম্মুখস্থ দীর্ঘিকাকূলে নির্জ্জনে উপবেশন করিলেন। মুকুন্দনাথের বাটীতে প্রথম অবস্থিতি-সময়ে যে দয়াবতী রমণী, স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহাকে বাতাস করিয়াছিলেন, তিনিই সর্ব্বাগ্রে উমানাথের হৃদয় অধিকার করিলেন। সেই যৌবনোন্মুখ মনোহর মূর্ত্তি, নিশীথ-জ্যোৎস্না-আবরণে আবৃত হইয়া তাঁহার চিন্তা-স্তিমিত নয়নপথে নিপতিত হইল। সেই নিশীথে তিনি জাগরিত হইলে, কুমারী হস্তস্থিত তালবৃন্ত রাখিয়া যেরূপ সঙ্কুচিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। পরে তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, 'আপনি পথশ্রান্ত অতিথি' বলিয়া সেই মনোহারিণী যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, উমানাথ প্রণিধান পূর্ব্বক তাহার অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ করিলেন। অতিথির শ্রান্তিনাশ ব্যতীত কুমারী যদি আরও কিছু ভাবিয়া থাকে, উমানাথের পবিত্র মনে সে তর্ক উপস্থিত হইল না। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তার পর কহিলেন, "যে আমায় বলিয়া দিবে,—সেই প্রান্তরে ক্ষুদ্র সরোবরে প্রফুল্লনলিনী বারুণীই নিশীথব্যজন-

কারিণী দয়াবতী রমণী, অপর কেহ নহে, যে আমায় এ কথা বলিয়া দিবে, সে আমার পক্ষে মৃত শরীরে জীবন দান করিবে সন্দেহ নাই।”

উমানাথ উঠিলেন,—নিকটবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বিকসিত কুসুমরাজি সন্ধ্যা সমীরণে ঈষৎ দোলায়মান হইয়া অপূর্ব্ব সৌরভ বিতরণ করিতেছে। উমানাথ সেই সকল মনোহারিণী শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে দুর্নিবার চিন্তাভার হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পাইলেন। তিনি জানিতেন, তাদৃশ চিন্তায় মস্তিষ্ক আলোড়িত করায় কোন ফল নাই; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি কেবল চিন্তা করিতেই ভাল বাসিতেন, কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এই জন্যই বন্ধুরা যখন বলিয়াছিলেন, “তোমার মনের কথা বল, আমরা প্রতীকারের চেষ্টা দেখি।” উমানাথ তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। তিনি কার্য্যকুশল বন্ধুদিগের নিকট মনোভাব গোপন করিয়া অশান্তিদায়িনী চিন্তার শরণাপন্ন হইয়া রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যত্র বিরাজিতা চৈকা,
পুনঃ কা তত্র স্বাস্থতি।

সুরেন্দ্রনাথ বিপিনের পত্র পাইয়াছেন। পত্রখানি নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক। তাঁহার সম্বন্ধে বিপিন যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাতেই স্নেহলতা "না" এইমাত্র উত্তর দিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের মুখে আজি আর হাসি নাই। তিনি কোন প্রকারেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছেন না। স্নেহলতা যদি প্রবীণা রমণী হইতেন, তাহা হইলে, তাহার প্রত্যাখ্যানে সুরেন্দ্রনাথের মনে তত কষ্ট বোধ হইত না। তিনি ভাবিলেন, চতুর্দ্দশবর্ষীয় রমণী যখন তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছে, তখন অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে, সন্দেহ নাই। সুরেন্দ্র স্নেহলতার সহিত প্রথম দর্শনাবধি দুর্গাপুরে যতদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাবৎকাল-কৃত স্বকীয় কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলেন, তাহাতেও কোন অপরাধ পাইলেন না। তবে আসিবার সময় স্নেহলতাকে যে সম্ভাষণ করিয়া আইসেন নাই, তাহাই তাঁহার মনে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, 'সেই জন্যই স্নেহলতা বোধ হয় এত অসন্তুষ্ট হইয়াছে।'

ভাবিতে ভাবিতে পত্রখানি খুলিয়া পুনর্ব্বার পড়িলেন; দেখিলেন, স্নেহলতা বলিয়াছেন, 'লিখিয়া দাও, স্নেহলতা মরিয়াছে।' "এ কথার অর্থ কি?" সুরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, এ কথা

স্নেহলতার চিত্ত-বিরক্তিমাত্র। আমি যাহাকে চাই না, সে কেন আমাকে ভালবাসিয়া পত্র লেখে; ইহাই স্নেহলতার বিরক্তির কারণ; তাই অনধিকার-চর্চ্চা করিতেছি বলিয়া আমাকে এক কথাতেই নিরুত্তর করিবার জন্য বলিয়া থাকিবে, "লিখিয়া দাও, স্নেহলতা মরিয়াছে।"

সুরেন্দ্র এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান-জন্য তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট বোধ হইল না। তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা সত্ত্বে স্নেহলতা অন্যের হস্তে সমর্পিত হইলে আজীবন অনুতাপের কারণ হইবে, প্রথমে সুরেন্দ্রের মনে এই আশঙ্কা ছিল; কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহার প্রতি স্নেহলতার সেরূপ শ্রদ্ধা বা ভালবাসা কিছুই নাই, তখন আর তাঁহার দুঃখিত হইবার কারণ কি?

সুরেন্দ্র চিন্তাজাল অপসারিত করিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল হইল; স্নেহলতার কথা লইয়া তিনি এতদিন যে কারাভোগ করিতেছিলেন, আজি যেন তাহা হইতে উন্মুক্ত হইলেন। তিনি সান্ধ্য সমীরণ সেবনের জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়; রেলওয়ে ষ্টেসনে সায়াহ্ণ পাঁচ ঘটিকার ট্রেন আসিয়া যাত্রীদিগকে নামাইয়া দিয়াছে। একটী বৃদ্ধ ষ্টেসন হইতে বহির্গত হইয়া কালীঘাটের পথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন; কেহই তাঁহার কথায় উত্তর দিতেছে না। ষ্টেসনে যে সকল মহাত্মা উন্মুখভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা মোট হইবে না, গাড়ী হইবে না, শুনিয়া সরিয়া যাইতেছেন, গরিবের কথায় উত্তর দিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। বৃদ্ধ ষ্টেসন

হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দৃষ্টি-পথে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু! সম্মুখে অনেক পথ দেখিতেছি, ৺কালীঘাট কোন্ পথে যাইতে হয়?"

পথ দেখাইয়া দিয়া, তিনি কোথা হইতে আসিলেন, কোথায়ই বা যাইবেন, এই বিষয় সুরেন্দ্রনাথ জানিতে ইচ্ছা করিলেন। বৃদ্ধ কহিলেন, "আমি কাশী যাইতেছি। সম্প্রতি ৺কালীঘাট যাইব;—তথায় কিছুদিন থাকিয়া পশ্চিম যাত্রা করিব।"

সুরেন্দ্র। আপনি বোধ হয় আর কখনও কালীঘাট আইসেন নাই?

বৃদ্ধ। আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার পথঘাট কিছুই ঠিক নাই।

সুরেন্দ্র। কালীঘাটে কোথায় যাইবেন?

বৃদ্ধ। তাহার কিছু ঠিক নাই, শুনিয়াছি, তথায় যাত্রীদিগের থাকিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

সুরেন্দ্র। তা আছে, কিন্তু তথায় আজি কালি জুয়াচোরের বড়ই প্রাদুর্ভাব। অপরিচিত বিদেশী লোক পাইলে, তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া লয়; তাই আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি।

বৃদ্ধ। এখন বাবা সর্ব্বত্রই জুয়াচোর হইয়াছে; তা ভগবান্ আছেন। এই বলিয়া বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত পুনরায় কহিলেন, "আহা! বাছাকেও ভগবানের নামে ফেলিয়া আসিয়াছি।"

সুরেন্দ্র। দেশে আপনার কে আছে?

বৃদ্ধ। আর কে আছে? কেবল একটী মেয়ে, বিবাহের উপযুক্ত, তাহার পিতৃব্য এক প্রকার পাগল, সেই পাগলের কাছেই তাহাকে রাখিয়া আসিতে হইয়াছে।

স্থরেন্দ্র। কেন, তাহার বিবাহ দিয়া আসা হইল না কেন?

বৃদ্ধ। সেটী আমার অদৃষ্টে ঘটিল কৈ? তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই এতাবৎ কাল যে পাত্রে অর্পণ করিব স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, সে আমার একটী বন্ধুর ছেলে, ছেলেটী ভাল, তাহার নাম স্থরেন্দ্র।

স্থরেন্দ্র। সে বরের সঙ্গে হইল না কেন?

বৃদ্ধ। আমার দুরদৃষ্ট! মেয়েটী আমার বয়ঃস্থা, দেখিতে সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায়; কথায় বার্ত্তায়—কাজে কর্ম্মে যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী; কি কারণে পাত্রের পছন্দ হইল না, কেমন করিয়া বলিব? পাঠকগণ এখন বোধ হয় এই বৃদ্ধকে চিনিতে পারিয়াছেন। ইনিই মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,—বারুণীর পিতা বলরাম।

যে দিন স্থরেন্দ্র বলরামের বাটীতে গিয়াছিলেন, সে দিন তাঁহার অন্তঃকরণ স্নেহলতার মূর্ত্তিতে তন্ময় ছিল; বারুণী তাঁহার নয়নপথে পতিত হইয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের কণিকামাত্র স্থানও অধিকার করিতে পারেন নাই। বারুণীর সেই রাকাশশধরসন্নিভ মুখমধুরিমার প্রতি তিনি একবার সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়াও দেখেন নাই, স্থতরাং বৃদ্ধের বাক্যের আর কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমি আপনার সহিত কথা কহিতে কহিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি; চলুন, মাকে দর্শন করিয়া আসি।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনিচ্ছুরপি দৈবেন,
পুনর্দ্রষ্টুমিহার্হতি।

আজ মুকুন্দনাথের মুখশ্রী গম্ভীর; জ্যেষ্ঠ যে গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া গিয়াছেন, এখন হচ্ছে, হবে—শ্যামসুন্দরই আছেন, এই সকল কথা বলিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিবার যো নাই। ঘরে অবিবাহিতা ষোড়শী কন্যা; আজ নিশীথে মুকুন্দনাথের নিদ্রা নাই।

অতিথির শয্যাপার্শ্বে,—নিদ্রিত অতিথি উমানাথের নিশীথ—শয্যার পার্শ্বে, স্বতঃ-প্রবৃত্তা ব্যজনকারিণী বারুণীকে দেখিয়া মুকুন্দনাথের অন্তঃকরণে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সে আশা ভগ্ন হইয়াছে; চঞ্চলপ্রকৃতি উমানাথের আকস্মিক পলায়নে সে আশালতিকা অকালেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তথাপি মুকুন্দনাথ এককালে হতাশ হইলেন না, তিনি উমানাথকে বারুণীর বর স্থির করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু সে কথা তাঁহার মনেই ছিল, নিরপরাধ উমানাথ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। মুকুন্দ মনে করিয়াছিলেন, চক্রধারী ভগবান্ শ্যামসুন্দরের চক্রে এই কার্য্য অনায়াসেই সুসম্পন্ন হইবে। তিনি জানিতেন না, লৌহবর্ত্মময় ভারতভূমিতে পৌরাণিক বিবাহের দিন আর নাই।

মুকুন্দনাথ প্রত্যূষে উমানাথের অন্বেষণে বাহির হইলেন। একজন শিষ্য, দুইজন বৈষ্ণব এবং বারুণী শ্যামসুন্দরের সেবায়

নিযুক্ত রহিলেন। বারুণী পুষ্প চয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে একজন প্রতিবেশিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বারুণি! তোমার কাকা অত প্রত্যূষে কোথায় গেলেন?"

বারুণী। তাহা জানি না।

প্রতি। তবে তোমায় সুসংবাদ দিই, তিনি তোমার বর আনিতে গিয়াছেন।

বারুণী ফুল তুলিতে তুলিতে কহিলেন, "দিদি! এই ফুলগুলি দিয়া শ্যামসুন্দরের মালা গাঁথিয়া দিব।"

বারুণী বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করাইতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া প্রতিবেশিনী আর অধিক কথা কহিলেন না।

বারুণী মনে মনে কহিলেন, "শ্যামসুন্দর! আমায় রক্ষা কর, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা কর, রাধিকাবল্লভ! বনমালি! তুমিই আমার হৃদয়মন্দিরে অবস্থান কর।"

বারুণী পুষ্পচয়ন করিয়া শ্যামসুন্দরের পূজার সজ্জা করিতেছেন, বেলাও দুই চারিদণ্ড হইয়াছে, এমন সময়ে তাঁহার পিতা বলরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বারুণী পিতাকে দেখিয়া আনন্দে অধীরা হইয়া "ঐ বাবা আসিয়াছেন" বলিয়া সমীপবর্ত্তিনী হইতেছিলেন, কিন্তু সহসা শিলাপ্রতিহত তরঙ্গিণীর ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী অপরিচিত যুবক আসিতেছেন। পাঠক! বোধ হয় যুবককে চিনিতে পারিয়াছেন; ইনিই সুরেন্দ্রনাথ;—বৃদ্ধ বলরামের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বারুণীকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। বলরাম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আজ ষোল বৎসর যাবৎ যাহার হাতে সমর্পণ করিব ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম,

সে একবার মেয়েটীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিল না? তাই সুরেন্দ্রনাথ বলরামের ক্ষোভ মিটাইতে আসিয়াছেন।

বারুণী আবার পূজার সজ্জা করিতে বসিলেন। তিনি পিতার পশ্চাদ্ভাগে কাহাকে দেখিলেন, কেমন দেখিলেন, তাহার কিছুই ভাবিলেন না। বলরাম পরম যত্নসহকারে সুরেন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রও পিতৃবন্ধুর বাটীতে আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে বিশেষ লজ্জা বা সঙ্কোচ করিতে হইল না। যে আমার বাল্যকালের অবস্থা বলিতে পারে, শৈশবের ঘটনা যাহার অবিদিত নাই, তাহার নিকট আবার মান অপমান কি? আজি সুরেন্দ্রনাথও সেই জন্য বলরামের নিকট কোনরূপে অভিমান প্রদর্শন করিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডল সপ্রতিভ, নয়ন প্রসাদ-বিশিষ্ট এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন অপূর্ব্ব লাবণ্যময়। তিনি বলরামের সহিত কয়েক দিন আলাপ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার প্রতি বলরামের অকৃত্রিম স্নেহ; তিনি শৈশবে বলরামের কোলে উঠিতেন, বারুণীর সহিত খেলা করিতেন। তিনি ও বারুণী একত্র দাঁড়াইলে, তাঁহার স্বর্গীয় পিতা বলিতেন, "বেশ মানিয়েছে।" এ সকল কথা সুরেন্দ্রের স্মরণ ছিল, এই জন্যই তিনি বলরামের বাটীতে কুণ্ঠিত—লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইলেন না।

বলরাম বারুণীকে কহিলেন, "মা! লজ্জা করিও না, সুরেন্দ্রনাথ আমার বন্ধুর পুত্র, বাল্যকালে উভয়ে একসঙ্গেই প্রতিপালিত হইয়াছ, দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃই আজ বারবৎসর পরস্পর দেখা শুনা নাই, তাই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। তুমি উঁহারকাছে যাইতে বা উহাঁর সহিত কথা কহিতে কোন সঙ্কোচ করিও না।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ব্রীড়া মে দহতে গাত্রং,
সা হি বিরামনাশিনী।

স্নেহলতা বিপিনের ঘরে কি খুঁজিতেছেন। বিপিনের বালিসের নীচে—জামার পকেটে—এখানে সেখানে কত খুঁজিলেন, কলিকাতার কোন পত্র আসে নাই। কোমলপ্রাণা বালিকার মুখ নৈরাশ্য-ছায়ায় মলিন হইয়া উঠিল!—কেন, নৈরাশ্য কেন? স্নেহলতা কি কলিকাতার পত্রের আশা করিয়াছিলেন? তিনি ত সকল কথাতেই "না" বলিয়াছেন। বিপিন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "তাহাকে আসিতে লিখিব?" স্নেহলতা বলিয়াছেন, "না।" "তাহার সহিত ভাল করিয়া দেখা শুনা হইবে? "তাহাকে কি দেখিতেও ইচ্ছা হয় না?" "না।" এখন আবার কলিকাতার পত্রের আশা কেন?

বিপিন জানিতে পারিলেন, স্নেহলতা মাঝে মাঝে সুরেন্দ্রনাথের পত্রের খোঁজ করেন। তিনি একদিন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্নেহলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নেহলতা! আবার কলিকাতার পত্রের খোঁজ কেন?"

স্নেহলতা কোন কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার নবনীরদ-বিনিন্দিত সুনীল নয়নে মুক্তাফলগঞ্জিত দুই বিন্দু জল আসিয়া দেখিতে দেখিতে গণ্ডদেশ অভিষিক্ত করিল। বিপিন স্তম্ভিত হইলেন। স্নেহলতা অধোবদনে নীরব,—নিস্পন্দ,—

আকাশপটে চিত্রপুত্তলির ন্যায় বিরাজমানা! বিপিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নেহলতা! আমায় মনের কথা বল দেখি।"

স্নেহলতা কোন কথা কহিলেন না, ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

বিপিনের ভাবনা বাড়িল। বিপিন বুঝিতে পারিলেন, স্নেহলতা সেদিন যে 'না' কহিয়াছিলেন, সে কেবল লজ্জার অনুরোধে; বাস্তবিক তাঁহার মনের ভাব 'না' নহে। বিপিন সত্বর হইলেন, তিনি অবহিতচিত্তে স্নেহলতার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিপিন স্নেহলতার গৃহের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। স্নেহলতার মুখশ্রী গম্ভীর, স্নেহলতা কি লিখিতেছেন। বিপিন নৈশ অন্ধকারে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া নিস্তব্ধভাবে জানালার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া স্নেহলতার উৎসাহপূর্ণ নির্ম্মল মুখচন্দ্রিমা দেখিতেছেন। তাঁহার উপর যে গুরুতর কার্য্যের ভার বিন্যস্ত হইয়াছে, ক্রমশই তাহার বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ব্যগ্রতাসহকারে সমধিক চেষ্টা করিয়া দেখিতেছেন।

অনুতাপ-বিমর্ষ-প্রপঙ্কিত স্নেহলতার মুখশ্রী কেমন হইয়াছে, পাঠক! যদি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র কবির ক্ষুদ্র লেখনীতে তাহা দেখিবার প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে বিফলমনোরথ হইবেন।

স্নেহলতার মুখশ্রী গম্ভীর, অথচ হৃদয় যেন ব্যগ্রতায় সমাকুল। তিনি হাসিতে হাসিতে 'না' করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে হারাইবার উপক্রম করিয়াছেন, তাঁহার মুখশ্রী এখন সেই অনুতাপে অনুতপ্ত। বিপিনের নৈরাশ্যব্যঞ্জক পত্র পাইয়া সুরেন্দ্রনাথ কি মনে করিয়াছেন, তাঁহার মুখশ্রী সেই ভয়ে ভীত। যে বিপিনকে তিনি

পরম হিতৈষী আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাঁহারই অপরিণত বুদ্ধিতে সুরেন্দ্রনাথকে হারাইবার উপক্রম করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার মুখশ্রী আজি এরূপ বিষাদে পরিপূর্ণ।

পত্র সম্পূর্ণ হইল না;—একবার লিখিলেন, লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন,—আবার লিখিলেন, আবার ছিঁড়িলেন। কতবার কত কাগজ নষ্ট হইল, কত ভাবনা আসিয়া জুটিল, কত নূতন নূতন ভাব উপস্থিত হইল, কিছুতেই মনস্থির হইল না। পত্র সম্পূর্ণ হইল না, অথচ স্নেহলতা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

আদ্যোপান্ত দেখিয়া বিপিন অনুতপ্ত অন্তঃকরণে নিজ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এতদিন তিনি স্নেহলতার "না"র অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। কেন যে স্নেহলতা "লিখিয়া দাও, স্নেহলতা মরিয়াছে" একথা বলিয়াছিলেন, এতদিন তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম বিপিনের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। আজি তিনি ঐ সকল কথার প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিলেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, স্নেহলতার মুখে ঐ যে কথা বাহির হইয়াছিল, উহা বিরক্তিব্যঞ্জক নহে, বরং ভালবাসার চিহ্ন। যাঁহারা রমণীসংসর্গে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাই রমণী-হৃদয়ের ঐ প্রকার ব্যঙ্গভাব বা ব্যঙ্গোক্তি বুঝিতে পারেন; সুতরাং বিপিনের পক্ষে তাহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ সরল-প্রকৃতি স্নেহলতা যে কোন কথা ব্যঙ্গভাবে বলিবেন, এ ধারণা বিপিনের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই। তিনি একবারও মনে ভাবেন নাই যে, স্নেহলতার হৃদয়ে এমন কোন অভিনব ভাব প্রবেশ করিয়াছে, যাহাতে তিনি কেবল আত্ম-গোপ-

নেই যত্নবতী। এই সকল কারণে বিপিন পূর্ব্বে স্নেহলতার আন্তরিক মনোভাব বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া এখন অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের অবিমৃশ্যকারিতা প্রকাশ করিয়া স্বীয় ভ্রমের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক পুনরায় সুরেন্দ্রনাথের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন; আপনার ভ্রান্তি ও অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"আশা ফলবতী যা হি
সৈব বারাণসী গতিঃ।"

বেলা দ্বিপ্রহর। প্রখর নিদাঘসূর্য্যের দুঃসহ কিরণে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চরাচর একান্ত সন্তাপিত। মুকুন্দনাথের আশ্রমে বৈষ্ণবগণ নিদাঘসন্তপ্ত কলেবরে নাট্যমন্দিরে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। আশ্রমবাসী বিহগকুল নিবিড় পল্লবাভ্যন্তরে কুলায়ে বসিয়া অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়া আছে; ধেনুগণ অশ্বত্থ প্রভৃতি নিবিড় পল্লবাকীর্ণ সুবৃহৎ তরুমূলে বসিয়া শান্তির আশা-পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। বস্তুতঃ জীবমাত্রেরই বিরাম নাই, কেবল সুরেন্দ্রনাথ সরল-প্রকৃতি কোমলাঙ্গী বারুণীর গুণে সুখে ঘুমঘোরে অচেতন রহিয়াছেন। নিদাঘ-জনিত কোন কষ্টই তাঁহার অনুভূত হইতেছে না, বারুণী তাঁহার মস্তকের দিকে উপবেশন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছেন।

অকস্মাৎ সুরেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বারুণীর দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "বারুণি! আর বাতাস করিতে হইবে না।"

অমনি বারুণী তালবৃন্তখানি পার্শ্বদেশে রাখিলেন, তাঁহার সুতপ্তকাঞ্চনকল্প বাহুলতিকার মৃদুগতি বন্ধ হইল। তিনি ধীরে ধীরে মৃদু মধুর বচনে কহিলেন, "তবে আমি এখন যাই?"

"আমি এখানে একা থাকিব?"

বারুণী গমনে উদ্যত হইয়াছিলেন, অকস্মাৎ সুরেন্দ্রের মুখে এই কথা শুনিয়া অধোবদনে পুনরায় উপবেশন করিলেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ অনিমিষ নয়নে বারুণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সরলা পূর্ণকলেবরা প্রশান্ত-মূর্ত্তি স্রোতস্বতীর ন্যায় গম্ভীরা, দর্শকের হৃদয়োন্মাদক কোনরূপ তরঙ্গ তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয় না। সুরেন্দ্র স্নেহলতার নয়ন-কোণে—অধর-প্রান্তে যেরূপ মনোহর লহরীলীলা দেখিয়াছিলেন, বারুণীতে তাহার বিন্দুমাত্রও নাই। ইহাঁর বদন-সুষমা গভীর, চক্ষু নিশ্চল, বারুণী অধোমুখে সমাসীনা। সুরেন্দ্র ক্ষণকাল বারুণীর এই সকল ভাব সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বারুণি! তোমার কি মনে পড়ে, আমাকে আর কখনও দেখিয়াছ ?"

ধীরে ধীরে বারুণী উত্তর করিলেন, "সে বাড়ীতে দেখিয়াছি।"

বারুণীর মুখে এইরূপ বিনয়-নম্র মধুর বাক্য শুনিয়া সুরেন্দ্র আবার যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বারুণীও তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে দিন আমি তোমার সহিত কথা কহি নাই, কোনরূপ আদর করি নাই, তাহাতে কি তুমি দুঃখিত হইয়াছ ?"

"না।"

"আমাকে আজি বাটী যাইতে হইবে। যদি আজি নাও হয়, কল্য প্রাতেই যাইব।"

"না, তাহা হইলে বাবা বড়ই দুঃখিত হইবেন—বাবা আমার উপর রাগ করিবেন।"

"তুমি আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কও না, আমার দিকে ফিরিয়া চাও না, আমি এখানে থাকিয়া কি করিব ?"

"এইত চাহিতেছি।"—এতক্ষণ বারুণী অধোবদনে থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথের কথার উত্তর দিতেছিলেন, এইবার মুখ তুলিয়া—তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এইত চাহিতেছি, আমি তোমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিব।"

এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যদি তোমাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করি ?"

"সে বিষয়ের উত্তর আমি জানি না, বাবা বলিতে পারেন !"

সুরেন্দ্রনাথ বারুণীর মুখে এই উত্তর শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বারুণি! নিজে দেখিয়া মনোমত বর লইতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না ?"

বারুণী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "না।"

সুরেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্যে দেখিয়া বিবাহ দিলে যদি তোমার মনোমত না হয় ?"

বারুণী নিরুত্তর,—এ প্রশ্নের উত্তর সুরেন্দ্রনাথ পাইলেন না। বারুণীকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার কাকাও ত বর আনিতে গিয়াছেন, তিনি যদি আর এক বর আনেন ?"

বারুণী মৃদু মধুর বচনে কহিলেন, "আমি তাহাকে দেখিব না।"

বারুণীর অন্তর পরিজ্ঞাত হওয়াই সুরেন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু বারুণীর মনোগত ভাব তাঁহার উপলব্ধি হইল না। বারুণী উন্মুখযৌবনা অন্যান্য কামিনীর ন্যায় স্বাধীন প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী নহেন, তিনি অদৃষ্টবাদিনী। অগ্রে বর দেখিয়া বরণ করা তাঁহার ইচ্ছা নহে, অলঙ্ঘনীয় অদৃষ্ট-চক্রে তাঁহাকে যাহার হস্তে পড়িতে হইবে, তিনি তাহারই অঙ্কলক্ষ্মী হইবেন। আহা! বিবেচনা

করিয়া দেখিলে বারুণীর মনের ভাব মহোচ্চ বলিলেও যুক্তি-বিরুদ্ধ হয় না। যাহা হইক, নির্জ্জন গহন কাননে লোক-বিমোহিনী কমলিনী প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, যাহার অদৃষ্টে আছে সেই লাভ করিবে। অদৃষ্টবাদী বৈষ্ণবের হস্তে প্রতিপালিতা হইয়া বারুণী স্বাধীন প্রবৃত্তিকে জয় করিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে বারুণীর সে ভাব যুক্তিযুক্ত ও প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইল না। তিনি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, একমাত্র সুশিক্ষার অভাবেই উপযুক্ত সময়েও এই বালিকার মানসিক বৃত্তি সকল সতেজ হইয়া বিকাশিত হইতে পারিতেছে না।

সুরেন্দ্রনাথ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, অকস্মাৎ বহির্ব্বাটীতে বিপদসূচক কোলাহল সমুখিত হইল। সেই শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র সুরেন্দ্র ও বারুণী দ্রুতপদে বহির্ব্বাটীতে উপনীত হইলেন;—দেখিলেন, বারুণীর পিতা বলরাম সহসা উৎকট পীড়ায় সমাক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি মণ্ডপের বারাণ্ডায় শয়ন করিয়াছিলেন, সহসা সর্ব্বশরীর স্বেদাক্ত, চক্ষু নিস্পন্দ ও বাক্‌রোধ প্রায় হইয়া পড়িয়াছে; কেহই রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না। বারুণী শোকবিহ্বলহৃদয়ে "পিতা, পিতা" বলিয়া অনেকবার সম্বোধন করিলেন, কিন্তু উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তাঁহার শোকাগ্নি দ্বিগুণতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সজল-নয়নে পিতার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুরেন্দ্রও পার্শ্বে উপবেশন করিয়া স্বহস্তে বলরামের সেবা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে দুই তিনজন চিকিৎসক সমাগত হইলেন। যথানিয়মে ঔষধির ব্যবস্থা হইলে রোগীকে ঔষধ সেবন করান

হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই অসংখ্য লোকে আশ্রম জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। বারুণীর নয়নাশ্রুর আর বিরাম নাই, ক্রমে বক্ষঃস্থল ভাসমান হইল দেখিয়া সুরেন্দ্র প্রবোধ বচনে কহিলেন, "বারুণি! কাঁদিও না, ভয় কি? এ রোগ মারাত্মক নহে।"

বলরামের অধরপ্রান্তে নৈরাশ্যব্যঞ্জক হাস্যের রেখা দেখা দিল। ঔষধের প্রভাবে অপেক্ষাকৃত যৎকিঞ্চিৎ চৈতন্যসঞ্চার হইয়াছে বটে, কিন্তু বাক্‌স্ফূর্ত্তির সামর্থ্য নাই। তিনি সুরেন্দ্রের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক অর্দ্ধপরিস্ফুট বচনে কহিলেন, "এ রোগ বড়ই কঠিন, এই রোগেই তোমার পিতার মৃত্যু হয়।"

বারুণীর হৃদয়ে আর ধৈর্য্যের স্থান হইল না। তিনি মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন;—"বাবা! আমার দশা কি হবে" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন বলরাম ধীরে ধীরে হস্ত তুলিয়া নিষেধ করত কহিলেন, "মা। কাঁদিও না, তোমার চিন্তা কি?—আমি তোমাকে যাহার হাতে দিয়া যাইতেছি, কোন কষ্ট পাইবে না।—মা! আমার—এই—আশী বৎসর—আর কত———?"

দরদরধারে বারুণীর লোচনাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রও আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কতিপয় প্রতিবাসী প্রাচীন লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলরামকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই বলরাম! যদি তুমি ফিরিয়া না আসিতে, তাহা হইলে আজি তোমার কাশীধাম প্রাপ্তি হইত! যাহা হউক, তুমি কাশী যাত্রা করিয়াছিলে, এখন কাশীর পথেই বলিতে হইবে।"

বলরাম ধীরে ধীরে অতি ক্ষীণ অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "ভাই! সে জন্য আমার আক্ষেপ নাই। লোকে কাশী গিয়াও বিশ্বেশ্বরকে পায় না, কিন্তু আমি পথেই পাইয়াছি, সেই জন্যই ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। বারুণীর যে গতি হইল, ইহাই আমার পূর্ণ কাশী।"

এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, আর কথা কহিতে পারিলেন না, নয়নপ্রান্তে ধীরে ধীরে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল, নেত্রদ্বয় ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইল। দেখিতে দেখিতে মহাশ্বাস,—মহামায়ার মোহপাশ ছেদনে প্রত্যক্ষ ভীষণ যাতনা, দেখিতে দেখিতে শরীর নিস্পন্দ, চক্ষু নিশ্চল, সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল হইল। এতদিনে তাঁহার সকল খেলার অবসান, বলরামের জীবন-পক্ষী দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"প্রাক্ বিলোপিতা যা হি
আশা সা পুনরুত্থিতা।"

এখন আর উমানাথের সেই পূর্ব্ব সন্দেহ নাই। যে প্রফুল্ল-নলিনীকে প্রান্তরমধ্যে সরোবরে স্নান করিতে দেখিয়াছিলেন, তিনিই যে নিশীথ-ব্যজনকারিণী দয়াবতী বারুণী, এখন উমানাথ তাহা বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিয়াছেন। মুকুন্দনাথের মুখেই তাহা সমস্ত অবগত হইয়াছেন। এখন উমানাথ আর এক গুরুতর সমস্যা উত্থাপন করিয়াছেন, সে সমস্যার উত্তর প্রদান করা মুকুন্দনাথের অসাধ্য। উমানাথ জানিতে চাহেন, বারুণী তাঁহাকে প্রকৃত ভালবাসে কি না?

উমানাথ স্পষ্টাক্ষরেই মুকুন্দকে বলিলেন, "বারুণী আমাকে ভালবাসে কি না, এ কথা জানিতে না পারিলে আমি বিবাহে সম্মতি দিতে পারি না। নিশীথে আমার শয্যার পার্শ্বে বারুণীকে দেখিয়া আপনার মনে আশার সঞ্চার হইতে পারে সত্য, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমি তৎকালে কোন আশাকেই হৃদয়ে স্থান দিই নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, বারুণী যে আমার সেবা করিতেছেন, উহা নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার লক্ষণ এবং উহাই আতিথ্যপরায়ণতার চরম সীমা। উহাকে ভাল-বাসার লক্ষণ মনে করিলে সদ্‌গুণের অবমাননা করা হয়,

অধিকন্তু নিজের স্বার্থপরতা প্রকাশ পায় মাত্র। অন্তঃকরণকে স্বার্থপরতায় কলুষিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে।"

মুকুন্দনাথ আর আগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারেন না, অগত্যা তাঁহাকে বাটী প্রতিগমন করিতে হইল। তবে এইরূপ কথা স্থির থাকিল যে, যদি বারুণী আন্তরিক ইচ্ছা সহকারে সাক্ষাৎ করিতে সম্মতা হন, তাহা হইলে উমানাথ আর একবার মথুরাপুরে যাইবেন। অগত্যা মুকুন্দনাথ সেই কথা ধার্য্য করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে জ্যেষ্ঠের মৃত্যুসংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তখন তাঁহার শোকের পরিসীমা থাকিল না। কি করিবেন, জগতের গতিই এই, সকলি শ্যামসুন্দরের বিচিত্র লীলা ভাবিয়া কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য সহকারে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বাটীতে আসিয়া সুরেন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে কিয়ৎপরিমাণে আশার সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, ভগবান শ্যামসুন্দরই অভাগিনী বারুণীর উপায় করিয়া দিয়াছেন।

"লোকে কাশী গিয়াও বিশ্বেশ্বর পায় না, কিন্তু আমি পথেই পাইয়াছি"—বলরাম যখন মৃত্যুশয্যায় থাকিয়া এই কথা বলেন, সেই সময় হইতেই—সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সুরেন্দ্রের হৃদয়ে যুগপৎ শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া ও বিস্ময় সঞ্চার হইয়াছে। তদবধিই তাঁহার মন এক প্রকার অভিনব ভাবে সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে। বলরাম বারুণীকে সম্বোধন করিয়া আরও বলিয়াছিলেন, "তোমার চিন্তা কি? আমি তোমাকে যাহার হাতে দিয়া যাইতেছি, কোন কষ্ট পাইবে না।" সে কথাও সুরেন্দ্রের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি বারুণীকে গ্রহণ

করাই অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক প্রীতি সঞ্চার হইল না, কারণ তিনি কিছুতেই বারুণীর মন বুঝিতে পারেন নাই। যতদূর বুঝিয়াছেন, তাহাতে কেবল বারুণীর উদাসীনভাবের পরিচয় পাইয়াছেন মাত্র। সুরেন্দ্রনাথ একবার মনে মনে স্থির করিলেন যে, বারুণী আমাকে ভালবাসে কি না জিজ্ঞাসা করি। আবার ভাবিলেন, যখন বলরাম মৃত্যুশয্যায় থাকিয়া সেই সকল মর্ম্মভেদী অন্তিম বাক্য উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, যখন বারুণীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেছি, তখন পুনরায় তাহাকে ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিজেরই নির্বুদ্ধিতা ও লঘুতা প্রকাশ পাইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া বারুণীকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বিরত হইলেন।

অকস্মাৎ একখানি পত্র ডাকে সুরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। পত্রখানির উপরে অনেকগুলি মোহর ছাপা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, বহু স্থান ঘুরিয়া বিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। তখন সবিস্ময়ে পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন, বিপিনবাবুর স্বাক্ষর। পত্রখানিতে এইরূপ লিখিত আছে,—

"প্রিয় সুরেন্দ্রবাবু!"

"আমরা অনেক সময়ে নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া থাকি। মনে করি, আমরা যে সকল কাজ করিতেছি অথবা যাহা বুঝিতেছি, ইহাতে কিছুমাত্র ভ্রম নাই। কিন্তু বহুদর্শী মহাত্মারা সেরূপ জ্ঞান করেন না। বস্তুতঃ অনিত্য জগৎসম্বন্ধে আমরা কি জানি? কিছুই জানি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সামান্য বালিকার গতিবিধিও আমাদের স্থূল দৃষ্টিকে পরাভব

করে। বাল্যাবধি যাহাকে প্রতিপালন করিয়াছি, বলিতে গেলে যে আমার নিকটেই কথা কহিতে শিখিয়াছে, সেই স্নেহের পুতলি বালিকা স্নেহলতার হস্তে পড়িয়া আজি আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি এতদিনে তাহার মন জানিতে পারিয়াছি। এখন মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি,—স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে স্নেহলতা যেখানে যেখানে "না" বলিয়াছিল, সেই সেই স্থানেই তাহার হৃদয়ের ভাব "হাঁ।"

"তোমার প্রতীক্ষায় বহুদিন থাকিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। স্নেহলতা এখন নৈরাশ্য সাগরের তীরে দণ্ডায়মানা। এখন সে নিজ হস্তে লেখনী ধরিয়াছে।—ইচ্ছা, তোমাকে পত্র লিখে, কিন্তু কি বলিয়া লিখিবে, তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আশা পূর্ণ করিতে পারিল না। আমি গোপনে থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিলাম, একবার 'ভাই' একবার "সুরেন্দ্র" একবার 'দাদা' এইরূপ কতবার কতরূপ লিখিল, কিছুই মনোমত হইল না। অবশেষে কাগজগুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিল। যখন তোমাকে পত্র লিখিতে তাহার উৎসাহ হয়, তখন তাহার মুখের ভাব—নয়নকমলের ভাব—দেহের ভাব যদি স্বচক্ষে দেখিতে, তাহা হইলে স্পষ্টই তাহার হৃদয় তোমার হৃদয়ে মিশিত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে বুঝিতে না পারিয়া যে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি

শ্রীবিপিন।"

K. B. ROY
SOLE PROPRIETOR
1896.
BHOWANIPUR VERBENA LIBRARY.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"হৃদি যা রোপিতা পূর্ব্বং
ক্ষণাৎ বিলোপিতা হি সা।"

উমানাথের অন্তঃকরণ আজি আনন্দে উৎফুল্ল! নিশীথস্বপ্ন সত্য হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহার আনন্দের পরিসীমা নাই। যাঁহার অতুলনীয় রূপমাধুরী তাঁহার হৃদয়ে দিবানিশি বিরাজমান, জগতে যাহা অপেক্ষা প্রিয়তম ও মহত্তর পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই বলিয়াই তিনি স্থির করিয়াছেন, যে প্রশান্ত সরোজিনীকে সরোবরে দেখিয়া অবধি তাঁহার চিত্ত অপূর্ব্ব ভাবে বিমুগ্ধ ছিল, সেই বারুণী এখন তাঁহারই হইতে চলিল, সুতরাং আনন্দের কি আর সীমা আছে? তবে উমানাথ ভাবিতে লাগিলেন, সে সমস্যার উত্তর কি? যাহার উত্তর মুকুন্দনাথ দিতে পারেন নাই, তাহার মীমাংসা কি হইল? উমানাথ যখন মুকুন্দনাথের নিকট ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তখন তাদৃশ বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। এখন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "সরল-প্রকৃতি বালিকার নিকটে এরূপ গুরুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভাল করি নাই।"

উমানাথ আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া শ্যামসুন্দরের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লোকে কি মনে করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিলেন।

রাত্রি চারিদণ্ড সমতীত। আশ্রমে হরিসংকীর্ত্তন হইতেছে। বারুণী মণ্ডপপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নিশ্চল-শরীরে—একাগ্রচিত্তে হরিনাম শুনিতেছেন। উমানাথ অতিথিবেশে উপস্থিত হইয়া সেই অবকাশে প্রাণ ভরিয়া অনিমেষ-নয়নে বারুণীর রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে রুক্মিণী দেবীর মোহিনী মূর্ত্তি বিরাজমানা, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন, বারুণীর রূপের ছটা লাগিয়াই দেবীর অঙ্গ তাদৃশ সমুদ্ভাসিত হইতেছে।

কীর্ত্তন শেষ হইলে, উমানাথ আতিথ্য স্বীকার করিলেন। অতিথির আহারাদি না হইলে তাঁহার কোনরূপ পরিচয় জিজ্ঞাসা করা মুকুন্দের আশ্রমের নিয়ম নহে; সুতরাং উমানাথ একান্তে উপবিষ্ট হইলে বৈষ্ণবেরা তাঁহার যথাবিধি অভ্যর্থনা করিল।

কথাপ্রসঙ্গে কোন বৈষ্ণবের মুখে বলরামের মৃত্যু-সংবাদ উমানাথের কর্ণগোচর হইল। তিনি আরও শুনিলেন, যে বলরাম মৃত্যুকালে সুরেন্দ্রের হস্তে বারুণীকে দিয়া গিয়াছেন। তখন উমানাথের হৃদয় যেন বজ্রাহত কদলীতরুর ন্যায় নিষ্পেষিত হইল। তিনি অবিলম্বে ছদ্মবেশ পরিহার পূর্ব্বক সুরেন্দ্রের কক্ষে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। বহুদিনের পর উমানাথের সাক্ষাৎ পাইয়া সুরেন্দ্র অতীব আনন্দিত হইলেন। তিনি কথোপকথন করিতে করিতে কহিলেন, "তুমি স্নেহলতাকে মনোনীত করিয়া আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলে, তৎপরে আর সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই। এতদিন তোমার বিবাহ হয় নাই কেন?"

"পরে আমার অমত হইয়াছিল।"

উমানাথের এই উত্তর শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত সহসা মত পরিবর্ত্তন হইল কেন?"

বারুণীকে দেখিয়াই উমানাথের মত পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সে কথা সুরেন্দ্রের নিকট কিরূপে প্রকাশ করেন, কাজেই উমানাথ এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মৌনভাবেই রহিলেন। তখন সুরেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বারুণীকে মনে ধরে ?"

"কখনই না।"—উমানাথ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "কখনই না।"

সুরেন্দ্র কহিলেন, "তুমি বারুণীকে দেখিয়াছ ?"

উমানাথ কহিলেন, "দেখিয়া থাকিব,—দেখিয়া থাকিব কেন, অবশ্যই দেখিয়াছি।"

"বারুণী ত স্নেহলতা অপেক্ষা অনেকাংশে সুন্দরী ?"

এই কথা শুনিয়া উমানাথ কহিলেন, "আমার চক্ষে স্নেহলতাই অধিক রূপবতী।"

হাস্য করিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তবে তুমি বারুণীকে ভাল করিয়া দেখ নাই। আচ্ছা, আমি তোমাকে দেখাইব।"

"আমি বেশ করিয়া বারুণীকে দেখিয়াছি, আর দেখিতে হইবে না।"

এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র কহিলেন, "ভাই! কেহই তোমার মনঃপূত হয় না, এখন উপায় কি ?"

"উপায় ?—উপায় মৃত্যু।"

সহসা উমানাথের মুখে এই কথা উচ্চারণ হইবামাত্র সুরেন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিলেন। উমানাথের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, হাসির লেশমাত্র নাই, একপ্রকার অভিনব অনির্ব্বচনীয় বিমর্ষভাব তাঁহার চিরপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল আবৃত

করিয়া রাখিয়াছে। তখন সুরেন্দ্র তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই! হঠাৎ তোমার এরূপ চিত্তবিকার জন্মিল কেন?"

উমানাথ লজ্জিত হইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তখন সুরেন্দ্র পুনরায় মধুর বচনে কহিলেন, "ভাই! হতাশ হইও না।"

উমানাথ আর কোন কথা না কহিয়া নীরবে রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"কিং কর্ত্তব্যং কি বক্তব্যং
চিন্তাকুলিতমানসঃ।"

যামিনী অবসানে উমানাথ বন্ধুর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। এ পর্য্যন্ত মুকুন্দনাথের সহিত উমানাথের কোনরূপ আলাপই হয় নাই,—উমানাথ, আলাপের আর প্রয়োজন নাই বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। সুরেন্দ্র আর একদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন বটে, কিন্তু উমানাথের নির্ব্বন্ধ কোনরূপেই বিচলিত হইল না দেখিয়া, অগত্যা প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় প্রদান করিলেন। গমন-সময়ে উমানাথের কাণে কাণে বলিয়া দিলেন, "ভাই, হতাশ হইও না।"

উমানাথ প্রস্থান করিলে সুরেন্দ্র অকূল চিন্তাসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। বারুণীলাভের জন্য উমানাথের হৃদয় যে একান্ত পিপাসু, সুরেন্দ্র স্পষ্টই তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি পূর্ব্বে আরও দুইবার মুকুন্দনাথের বাটীতে আসিয়াছিলেন, সে দুইবারও তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, মুকুন্দনাথ তাঁহাকেই বারুণীর বরপাত্র স্থির করিয়াছেন; কিন্তু এখন জানিতে পারিলেন যে, মুকুন্দনাথ উমানাথের হস্তে বারুণীকে সম্প্রদানের অভিলাষেই তাঁহাকে এ বাটীতে আনিয়াছিলেন। এই সমস্ত পূর্ব্বাপর ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

"বারুণীকে উমানাথের হস্তে সমর্পণ করিলে কি ভাল হয় না? উমানাথ অযোগ্য পাত্র নহে;—কুলে—শীলে—রূপে—গুণে কোন অংশেই ন্যূন নহে। বিশেষতঃ মুকুন্দনাথ পূর্ব্বে তাঁহাকেই বরপাত্র মনোনীত করিয়াছিলেন, ঘটনাচক্রে পড়িয়া বলরাম আমাকে মনোনীত করেন। পূর্ব্বসূত্র ধরিতে গেলে উমানাথই বারুণীর পাণিগ্রহণের ন্যায়তঃ উপযুক্ত পাত্র।" সুরেন্দ্র মনে মনে এই সকল চিন্তা করিয়া আবার ভাবিলেন, "বারুণী অদৃষ্টবাদিনী, তাহার অন্তরে স্বাধীন প্রবৃত্তি নাই। আত্মীয়-স্বজনেরা যাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, বারুণী তাহারই অঙ্ক-লক্ষ্মী হইবেন। সুতরাং আমি বারুণীর আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে মুকুন্দনাথ অবশ্যই বারুণীকে উমানাথের হস্তে সম্প্রদান করিবেন। তাহাতে বারুণীরও সুখের পথে আর বাধা দেওয়া হইবে না।"

সুরেন্দ্র মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া মুকুন্দনাথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি আর এখানে বিলম্ব করিতে পারি না। আমার অনেক কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে। বিশেষ আমি যে এখানে আছি, আমার জননীও তাহা অবগত নহেন; সুতরাং যত শীঘ্র হয়, আমার গৃহপ্রতিগমনই এখন সর্ব্বথা বিধেয়।"

মুকুন্দনাথ চমকিত হইয়া উঠিলেন। সুরেন্দ্রনাথের মুখে এই আকস্মিক বাক্য শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ে যারপর নাই বিস্ময় সঞ্চার হইল। তিনি মনের হরিষে বারুণীর বিবাহের আয়োজন করিতেছেন, এ সময়ে সুরেন্দ্রকে বিদায় দিলে আবার কোন্ দিন আসিবেন কি না, কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ কন্যা বয়স্থা—একান্ত অরক্ষণীয়া। সুতরাং তিনি বিস্মিত ও চমকিত

হইয়া কহিলেন, "আপনি আর দিন কতক প্রতীক্ষা করিলেই একেবারে শুভ কার্য্য সমাধা করিয়া দিই।"

নানারূপ আপত্তি প্রদর্শন করাইয়া সুরেন্দ্র কহিলেন, "আমি বাটীতে না গিয়া কোনরূপেই এখানে থাকিতে পারিতেছি না। তবে যদি আপনার অমত না হয়, তাহা হইলে আমি বারুণীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।"

মুকুন্দনাথ অতি সরলপ্রকৃতি। কুটিলভাব তাঁহার অন্তরে কোন কালেই স্থান পায় না। তিনি ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়া সর্ব্বসমক্ষে বারুণীকে সুরেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তখন বিবাহ একপ্রকার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সুরেন্দ্র এখানেই বিবাহ করুন্ আর বারুণীকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া শুভকার্য্য সম্পাদন করুন, একই কথা। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! বারুণী এখন আপনার, আমার নহে। আপনি নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবেন, ইহাতে আমার আর মতামত জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?"

সুরেন্দ্র মুকুন্দের এই কথা শুনিয়া একবার বারুণীর দিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, বারুণীর মুখপদ্ম যেন গাঢ়তর নীহারকণায় সমাচ্ছন্ন, আর সে পূর্ব্বতন হাস্য বা লাবণ্যলহরীর বিন্দুমাত্রও নাই। বারুণীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন শুনিয়া তাঁহার মুখচন্দ্র যেন বিষাদ-রাহুতে আক্রমণ করিয়াছে। বারুণী ধীরে ধীরে মুকুন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তা—আমি যাইব না।"

লোকজগতে একটা কোন নূতন কাণ্ড বা নূতন কথা উত্থাপিত হইলে জগত-জীবন সমীরণ যেন মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সংবাদ বহন করিয়া পাড়ায় পাড়ায় লোকের কাণে কাণে বলিয়া দিয়া আইসে। সুরেন্দ্র বারুণীকে লইয়া যাইবেন, এই সংবাদ পল্লী-মধ্যে সর্ব্বত্রই মুহূর্ত্তমধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি প্রতিবেশিনী রমণী মুকুন্দের গৃহে সমুপস্থিত হইল। "লোকে বিবাহ করিয়াই কন্যা লইয়া নিজ গৃহে যায়।—এ আবার কেমন যাওয়া? বয়স্থা—আইবুড়ো মেয়ে, একজন বিদেশীয় যুবার সহিত বিবাহের অগ্রেই যাইবে, ইহা ত কখনও শুনি নাই।" পথে ঘাটে প্রতিবাসিনীগণের মুখে কেবল এই কথারই আন্দোলন হইতে লাগিল।

সুরেন্দ্র ঐ সকল কথা শুনিয়া প্রতিবাসিনীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি আপনার ভাবিয়াই লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যদি আপনাদের তাহাতে অমত হয়, আমি নিরস্ত হইতেছি।"

প্রতিবাসিনীরা কহিলেন, "তুমি এখানে বিবাহ করিয়া লইয়া যাও, তাহা হইলে ত কাহারও আর কোনরূপ অমত থাকে না।"

"আমার সময় নাই।"—একটু যেন অসন্তোষের সহিত সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "আমার সময় নাই। বাটীতে জননী একাকিনী, অন্য অভিভাবক কেহ নাই, আমি অনতি-বিলম্বেই জননীর নিকট না গিয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

ধীরে ধীরে প্রতিবাসিনীরা আবার বলিলেন, "ভাল, যাও তাহাতে ক্ষতি নাই, আমরা ধরিয়া রাখিতে পারিব না, কিন্তু কবে আসিবে বলিয়া যাও।"

গম্ভীরস্বরে সুরেন্দ্র বলিলেন, "তাহা ঠিক কিরূপে বলিব? আমার আশায় থাকিয়া শেষে যে নিরাশ হইবেন, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে।"

তখন রমণীরা বুঝিতে পারিলেন যে, সুরেন্দ্রের অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে; সুতরাং তাঁহারা ভয়ে আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া অধোবদনে ধীরে ধীরে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। গমন-সময়ে বারুণীর কাণে কাণে বলিয়া গেলেন, "বারুণি! যাও,—না গিয়া আর কি করিবে?—না গেলে তোমার বর রাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"জহি জহি তাং দুরাশাং
স্থিরীভূয় রে মানস।"

উমানাথের অন্তঃকরণ নিরাশবহ্নির প্রখর দহনে অনুক্ষণ দগ্ধীভূত হইতেছে। যদি মুকুন্দনাথ উমানাথের বাটীতে না যাইতেন, প্রান্তরস্থিত সরসীনীরে স্নাতা প্রফুল্ল নলিনীই সেই নিশীথব্যজনকারিণী, উমানাথের যদি তাহা অপরিজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে কখনই আজি তাঁহার হৃদয়বহ্নি এরূপ প্রজ্বলিত হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে যাতনা প্রদান করিতে পারিত না। উমানাথ বারুণীর কথা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। এরূপ অনেক স্থলে অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, উন্মুখযৌবনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর রূপে বিমোহিত হইয়া প্রণয়-পিপাসু যুবক একান্ত বিচলিত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার সে মোহ—সে চাপল্য—সে উৎকণ্ঠা সকল সময়েই চিরস্থায়ী বা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। উমানাথও অনায়াসে আজি হউক, অথবা দশদিন পরেই হউক, অবশ্য বারুণীর কথা ভুলিতে পারিতেন। যে শরদিন্দুনিভ মুখচন্দ্রমা তাঁহার হৃদয়গগনে সমুদিত হইয়াছিল, সময়ে অবশ্যই তাহা কৃষ্ণমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া যাইত; যে দিগন্ত-শোভিনী চপলা তাঁহার পুরোভাগে আবির্ভূত হইয়া চিত্তমোহ জন্মাইয়াছিল, কিয়দ্দূর আসিয়া অবশ্যই তাহা আপনিই বিলীন হইত; কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকনিবন্ধন তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

নির্জ্জনে বসিয়া উমানাথ চিন্তাসাগরের তরঙ্গে দোদুল্যমান হইতেছেন। "সুরেন্দ্র বলিয়াছেন, "ভাই, হতাশ হইও না।" এ কথার তাৎপর্য্য কি?—না, এ কথার বিশেষ কোন অর্থ নাই। ক্ষুব্ধচিত্ত দেখিলে—মোহভাব দেখিলে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনেরা ঐরূপ আশাবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? সুরেন্দ্র উদারবুদ্ধি, তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিতেও পারিতেছি না, তাঁহার বাক্যের অবশ্য কোন নিগূঢ় অর্থ আছে। বারুণী এখন সুরেন্দ্রের হাতে, তিনি মনে করিলে অনায়াসে আমাকে দিতে পারেন।—না, তাহাও অসম্ভব। বলরাম মৃত্যুকালে বারুণীকে সুরেন্দ্রের হাতে হাতে দিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রের মনের ভাব যাহাই হউক না, যখন সে সময়ে কোন আপত্তি করেন নাই, তখন একপ্রকার গ্রহণ করাই হইয়াছে। এখন বারুণী সুরেন্দ্রের স্ত্রী। যদি বলরামের মৃত্যুকালে সুরেন্দ্র বারুণী-গ্রহণে আপত্তি করিয়া তাহার বিবাহের ভার লইতেন, তাহা হইলে বরং সুরেন্দ্রের আশ্বাস-বাক্যে নির্ভর করিয়া একপ্রকার ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহাও কোনরূপে সম্ভবপর নহে। এখন বারুণী সর্ব্বথাই সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী।"

নির্জ্জনে বসিয়া উমানাথ মনে মনে চিন্তাতরঙ্গের সহিত এই প্রকার তর্কবিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে সুরেন্দ্রের নৌকা আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল। নৌকায় বারুণী নাই,—তিনি আইসেন নাই। সুরেন্দ্রের প্রস্তাবে যে সকল প্রতিবাসিনীরা প্রথমতঃ খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় বারুণীকে সুরেন্দ্রের সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেও তিনি আইসেন নাই।

বারুণী আইসেন নাই কেন? যাঁহারা মানব-চরিত্রের স্থূল পরিদর্শক, তাঁহারা এ প্রশ্নের উত্তর এই দিবেন যে, বিবাহ হয় নাই বলিয়াই বারুণী আইসেন নাই। কিন্তু তাহা নহে, যে সকল বহুদর্শী উদারচেতা ব্যক্তি মানবহৃদয়ের অন্তস্থলে ডুবিয়া দেখিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাই এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে পারেন। বলরামের মৃত্যুর পর সুরেন্দ্রনাথ একদিনের জন্য ভ্রমেও একবার বারুণীকে ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। বলরাম মৃত্যুশয্যায় থাকিয়া যেরূপ করুণকণ্ঠে সুরেন্দ্রের হস্তে বারুণীকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে যে আবার সুরেন্দ্রনাথ পাণি-গ্রহণে চলিতচিত্ত হইবেন, এ কথাও একদিনের জন্য বারুণীর হৃদয়ে সমুদিত হয় নাই। পিতৃহীনা অভাগিনী বারুণী এই সকল বিষয় ভাবিয়া কতবার কান্দিয়াছেন, আবার আপনার বিষাদ-রাশি আপনার অন্তরেই বিলীন করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোন্ সাহসে বারুণী সুরেন্দ্রের অনুবর্তিনী হইতে ইচ্ছা করিতে পারেন?

ঘাটে তরণী লগ্ন হইবামাত্র উমানাথের নিকট সংবাদ গেল, তিনি অমনি সুরেন্দ্রের নিকট আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ যুগল বন্ধুর পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণের পর উমানাথ বলিলেন, "ভাই! যদি প্রণয়ের কথা উত্থাপন না কর, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ তোমার নিকট বসিতে পারি, নচেৎ এই পর্য্যন্ত।"

উমানাথের মুখে এই নির্ব্বেদবাক্য শ্রবণ করিয়া সুরেন্দ্রের প্রাণে আঘাত লাগিল। তিনি উমানাথের হাত ধরিয়া সাদরে নিকটে উপবেশন করাইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"আরাধ্যপত্রীং হৃদয়ে নিধায়,
সুষ্বাপ বালা মুদিতেক্ষণা চ।"

আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া—আশাতরী ধারণ করিয়া এখন স্নেহের পুত্তলী স্নেহলতা যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। অদ্যাপিও সুরেন্দ্রনাথের কোন পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল না। স্নেহলতার প্রাণে আর কত সহ্য হয়? মন চঞ্চল হইল--নয়ন অস্থির হইল—প্রাণ ব্যাকুল হইল। নানাবিধ নভেল ও উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করাই এখন স্নেহলতার নিত্যকর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। উৎকণ্ঠার সময়ে—মনশ্চাঞ্চল্যের সময়ে কোন্ নায়িকা কিরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, কি করিয়া তাহারা প্রাণের উৎকণ্ঠার শান্তিবিধান করিত, স্নেহলতা নানাবিধ পুস্তকে কেবল সেই সকল বিষয়েরই পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কোন নায়িকা গৃহ-ত্যাগিনী হইয়াছেন, কেহ বা বিষপানে প্রাণের জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন, কেহ বা আত্ম-ঘাতিনী হইবার উপক্রম করিয়া আবার মহাপাপ ভয়ে ধৈর্য্য সহকারে পাপবাসনা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন; এই সমস্ত পাঠ করিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠার শান্তিবিধান দূরে থাকুক, বরং চঞ্চলতা দ্বিগুণ বলবতী হইয়া উঠিল।

কার্য্যগতিকে উপযুক্ত সময়ে সুরেন্দ্রনাথ পত্রের উত্তর দিতে পারেন্ নাই। যখন স্নেহলতা একান্ত ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছেন, সেই সময়ে অকস্মাৎ সুরেন্দ্রনাথের একখানি পত্র বিপিনের হস্তগত হইল। বিপিন পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। পত্রের মর্ম্মে জানিতে পারিলেন যে,

বিপিনের ন্যায় সুরেন্দ্রও ভ্রমপ্রমাদে পড়িতেছিলেন, কিন্তু দৈবানুকূলে যথাসময়ে বিপিনের দ্বিতীয় পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। বিপিন আদ্যোপান্ত পাঠ করতঃ মৃদুমন্দপদসঞ্চারে স্নেহলতার গৃহে গিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে পত্রখানি রাখিয়া আসিলেন।

স্নেহলতার নবীন হৃদয়ে যে নবীন অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে, চিত্তচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাঁহার জননী এযাবৎ সে বিষয়ের কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি ঘটনাচক্রে বিশেষ কারণে কন্যার কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্নেহলতা বক্ষোপরি একখানি পত্র স্থাপন পূর্ব্বক ঘুমঘোরে অচেতন রহিয়াছে। কিসের পত্র, কাহার পত্র, বক্ষোপরিই বা কেন, এই সকল আন্দোলন করিয়া গৃহিণী ধীরে ধীরে পত্রখানি গ্রহণপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন ;—তাঁহার হৃদয় চমকিয়া উঠিল। স্নেহলতাকে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগিণী জানিয়া গৃহিণীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। দুর্গম প্রান্তর মধ্যে ভয়ানক বাত্যাবৃষ্টির সময়ে সুরেন্দ্রের যত্নেই স্নেহলতার জীবন রক্ষা হইয়াছিল, তদবধিই গৃহিণী সুরেন্দ্রের নিকট মনে মনে এক প্রকার ঋণী হইয়াছিলেন। স্নেহলতা সুরেন্দ্রের প্রতি অনুরাগবতী, স্নেহলতা তাঁহার করে অর্পিতা হইলে সেই ঋণ পরিশোধ হইবে, এই ভাবিয়া গৃহিণীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি এত দিন এক দিনের জন্যও মনে করেন নাই যে, সুরেন্দ্রের সহিত স্নেহলতার পরিণয় সম্বন্ধ ঘটিবে।

গৃহিণী ত্বরিতগতিতে পতির নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিলে দুর্গাদাস বাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জলদগম্ভীরে কহিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম,

মেয়েদের নভেল পড়িতে দেওয়া ভাল নয়। নাটক নভেল পড়িয়া স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তিনী হইলে ক্রমে সকল বালিকারাই স্বচক্ষে দেখিয়া আপন আপন বরপাত্র মনোনীত করিয়া লইবে, তাহা হইলে আমাদের দেশে আর সুমঙ্গলের আশা থাকিবে না। এ দেশের সামাজিক বন্ধন অতীব কঠিন; আদান প্রদানের নিয়মিত ঘর পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে। অঘরে কন্যাদান করিলে সমাজে মুখ অবনত হয়। সুরেন্দ্র আমাদের ঘর নহে, নচেৎ আমি পূর্ব্বে অনেকবার মনে মনে সুরেন্দ্রের কথা ভাবিয়া আবার নিরস্ত হইয়া রহিয়াছি। বালিকাদের মনে স্বাধীন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভব। যাহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে ঘৃণা বোধ হয়, কালচক্রে তাহারই হস্তে সাদরে কন্যাদান করিতে হইয়া থাকে। এখন দেখিতেছি, আমারও সেই দশা ঘটিল। সুরেন্দ্র অঘর সত্য, কিন্তু যখন কন্যা তৎপ্রতি অভিলাষিণী, তখন অন্যপাত্রে অর্পণ করিলে হয়ত ভবিষ্যতে একটা অত্যহিত ঘটাইতে পারে। অতএব এক কাজ কর, আমি দিন কয়েকের জন্য স্থানান্তরে যাই। তুমি বিপিনের দ্বারা সমস্ত আয়োজন করাইয়া শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পন্ন কর। আমি উপস্থিত থাকিলে আত্মীয় স্বজনেরা এ কার্য্যে বিশেষ বাধা দিয়া নিবারণ করিবেন। আমার অবর্ত্তমানে কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে যখন বাটীতে প্রত্যাগমন করিব, তখন আমার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বলিয়া কেহ কোনরূপ দোষারোপ করিতে পারিবে না।”

স্নেহের নন্দিনী স্নেহলতার বিবাহে পিতা না থাকিলে মনের অসুখ হইবে সত্য, তথাপি সে বিষয়ে কোনরূপ আগ্রহ প্রদর্শন না করিয়া গৃহিণী পতির মতেই অনুমোদন করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"ধর্ম্মবিঘটনং যত্র,
স্বাতুং তত্র ন রোচতে।"

আজি স্নেহলতা অবনতমুখী—লজ্জায় অধোমুখী। সুরেন্দ্রকে তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, সুরেন্দ্রের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়াছেন, সকলেই তাহা জানিতে পারিয়াছে;—মনের কথা এত দিনে প্রকাশ পাইয়াছে, তাই আজি স্নেহলতা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া কক্ষমধ্যে বসিয়া আছেন। পাঠকগণ! এ লজ্জা যে কি মধুময়, এ লজ্জাতে যে কি অমৃতময় আনন্দলহরী খেলা করে, তাহা যদি কখন দেখিয়া থাকেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন।

অকস্মাৎ একটী অতিথি আসিয়া দুর্গাদাসবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে নাতিস্থূল, গলদেশে ত্রিলহরী তুলসী মালা, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক শোভমান। অতিথির প্রশান্তমূর্ত্তি ও প্রকৃতিসিদ্ধ সরলভাব দর্শনে বিপিন বাবু পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। শ্রান্তি অপনোদনের পর আহারাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে অতিথি কহিলেন, "আমি বিষ্ণূপাসক, নিরামিষভোজী, বিশেষ পরান্ন গ্রহণ আমার নিষিদ্ধ। তবে আমার জন্য বিশেষ কোনরূপ আয়োজনের আবশ্যক নাই।"

বিপিন বাবু পরম যত্নে আয়োজন করিয়া দিলে, অতিথি রন্ধন করতঃ পরিতোষরূপে আহার করিলেন। আচমনান্তে সুখে সমাসীন হইলে বিপিন বাবুর সহিত তাঁহার নানাবিধ

কথোপকথন হইতে লাগিল। বিপিন বাবু তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

অতিথি কহিলেন, "আমার নাম মুকুন্দনাথ ঠাকুর। ঘোর সঙ্কটে পড়িয়া আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি; নচেৎ শ্রীশ্যামসুন্দরকে পরিত্যাগ করিয়া এক দিনের জন্যও স্থানান্তরে থাকি না।"

সঙ্কটের কথা শুনিয়া বিপিন আদ্যোপান্ত সবিস্তার শ্রবণ-পিপাসু হইলে মুকুন্দনাথ পুনরায় বলিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠের নাম বলরাম ঠাকুর! তাঁহার একমাত্র কন্যা। কন্যার তিনবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ঘটনাচক্রে পড়িয়া তিনি দ্বাদশ বর্ষের জন্য কারারুদ্ধ হন। আমি সুতনির্ব্বিশেষে সেই কন্যাটিকে প্রতিপালন করি। আমার জ্যেষ্ঠ দীর্ঘকালের পর কারামুক্ত হইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কন্যাটীর বিবাহের জন্য বিস্তর প্রয়াস পান, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের অভাবে পূর্ণমনোরথ না হইয়া অগত্যা কাশী-যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ নামক একটী যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সুরেন্দ্রের পিতা আমার জ্যেষ্ঠের পরম বন্ধু ছিলেন। সুরেন্দ্রকে পরম গুণশীল জানিয়া তাঁহারই হস্তে কন্যা সম্প্রদানার্থে সমভিব্যাহারে লইয়া বাটীতে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন। দৈবের নির্ব্বন্ধ কখন খণ্ডন হয় না, আমার জ্যেষ্ঠ বাটীতে আসিয়াই আকস্মিক উৎকট রোগে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সেই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিয়া ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর সমক্ষে তিনি কন্যাটীকে সুরেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথের মত পরিবর্ত্তন হইয়া

গিয়াছে, এখন আর তিনি বিবাহে সম্মত নহেন। আমিও বাগ্‌দত্তা কন্যাকে অন্য পাত্রে সমর্পণ করিতে সাহসী হইতেছি না। সেই জন্যই একবার সুরেন্দ্রের চেষ্টায় তাঁহার বাটীতে গমন করিতেছি।”

সুরেন্দ্রনাথের নাম শুনিবামাত্র বিপিন চমকিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কৌশলে আত্মভাব গোপনপূর্ব্বক সমবেদনা জানাইয়া অতিথির প্রতি নানাপ্রকার আশ্বাস বচন প্রয়োগ করিলে, মুকুন্দনাথ বিদায় গ্রহণ করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বিপিন যে সুরেন্দ্রনাথের পরিচিত এবং স্নেহলতার সহিত যে সুরেন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছে, অতিথি তাহার বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিলেন না।

মুকুন্দনাথ প্রস্থান করিলে বিপিন অকূল চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। মুকুন্দের মুখে সুরেন্দ্রের আচরণ শুনিয়া বিপিনের হৃদয় বিস্ময়ে স্তিমিত হইয়া পড়িল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, সুরেন্দ্রের সহিত স্নেহলতার বিবাহ হইলে বাগ্‌দত্তা কন্যার দশা কি হইবে? এদিকে সুরেন্দ্র ও স্নেহলতা উভয়ে পরস্পর যেরূপ প্রেমানুরাগে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সে প্রণয় রোধ করাও নিতান্ত সহজ নহে।

এক দিন, দুই দিন, ক্রমে তিন দিন অতীত হইল, তথাপি বিপিনের চিন্তার বিরাম নাই; তিনি মীমাংসা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। স্নেহলতার সহিত বিবাহ দিলে, বাগ্‌দত্তা কন্যার সুখের পথে কণ্টক প্রোথিত করা হয়, এ দিকে আবার স্নেহলতাকে সুরেন্দ্রের হস্তে না দিলে প্রণয়ভঙ্গরূপ মহাপাপ আক্রমণ করে, এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বিপিন দুর্গাদাস-

বাবুর বাটী পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। তাহা হইলে আর ভবিষ্যতে কোনরূপ নিমিত্তের ভাগী হইতে হইবে না।

বিপিন মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া গৃহিণীর নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, স্নেহলতার বিবাহ দেখিয়া সুখী হইব, কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহা হইল না। আমাকে বিশেষ কারণে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে।"

বিপিনের উপরেই সংসারের যাবতীয় ভার অর্পিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ দুর্গাদাস বাবু গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তাঁহারই উপর স্নেহলতার বিবাহের সকল ভার দিয়া গিয়াছেন। এখন হঠাৎ বিপিনের মুখে এরূপ অসম্ভব বাক্য বহির্গত হইল কেন, ইহা ভাবিয়া গৃহিণী একেবারে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন, "বিপিন! আমি তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তোমার অভিসন্ধি কি, মনোগত ভাব কি, প্রকাশ করিয়া বল।"

"আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার অভিসন্ধি কিছু নাই, মনোগত ভাবও কিছু নাই। আমি কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে থাকিতে বাসনা করিয়াছি।"

বিপিনের মুখে এই উত্তর শুনিয়া গৃহিণী পুনরায় বলিলেন, "কেন বিপিন! তোমার হাতেই স্নেহলতার বিবাহের ভার, সে কাজ ফেলিয়া যাইবার কারণ কি?"

"অন্যান্য লোকের দ্বারা সম্পন্ন করাইবেন। আমা দ্বারা যে এ কাজ সুসিদ্ধ হয়, তাহা বোধ করি না।"

এই কথা শুনিয়া গৃহিণী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি তোমার মন বুঝিয়াছি। পূর্ব্বে কেন এ কথা বল নাই?—স্নেহলতা ত তোমারই ছিল। কেন তবে তুমি সুরেন্দ্রকে পত্র লিখিয়াছিলে?"

গৃহিণীর মুখে এই কথা শুনিয়া বিপিন বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, "আপনি যেরূপ মনে করিতেছেন, আমার সে অভিসন্ধি নাই। আমি কোন প্রকারেই আত্মাকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করি না। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, আমি বিদায় হই।" এই বলিয়া তিনি মৃদুপদসঞ্চারে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

"হা হা গুরুরয়ং যত্র,
ফলং তত্র কুতো ভবেৎ।"

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। জলপূর্ণ কুম্ভকক্ষে রমণীগণ মৃদুমন্দ-পদসঞ্চারে গমন করিতেছেন। বালকেরা পল্লীর প্রান্তে প্রান্তে আনন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। রাখালেরা গোধন লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থিত হইতেছে।

ইত্যবসরে মুকুন্দনাথ সুরেন্দ্রের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীখানি দেখিয়া তাঁহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতলবাটী,—সম্মুখে নাতিপ্রশস্ত একটী ক্ষুদ্র পুষ্প-কানন। পুষ্পোদ্যানের পারিপাট্য ও সমগ্র বাটীর পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া বিলক্ষণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মুকুন্দনাথ উপস্থিত হইয়া বহির্ব্বাটীস্থ লোকের নিকট অতিথি বলিয়া পরিচয় দিলেন, কুটুম্ব বলিতে তাঁহার সাহস হইল না। বাটীর মধ্যে সুরেন্দ্রের নিকট সংবাদ গেল। তিনি অবিলম্বে আসিয়া মুকুন্দনাথকে দর্শনপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে সমাদরে প্রণাম করিলেন। মুকুন্দনাথ আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলে, সুরেন্দ্রের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইতে লাগিল। মুকুন্দনাথ কহিলেন, "বৎস! দীর্ঘকালের মধ্যে তোমার কোন সংবাদ না পাওয়াতে ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছি।"

"কেবলমাত্র সংবাদ লিখিবার প্রয়োজন হইলে এতদিন নিশ্চিন্ত থাকিতাম না, কিন্তু আপনারা যে বিষয়ের জন্য সমুৎ-

স্থক, আমি তাহাতে আশাব্যঞ্জক কোন কথা লিখিতে পারিব না বলিয়াই সংবাদ দিতে নিরস্ত ছিলাম।”

সুরেন্দ্রের উত্তর শ্রবণে বিস্মিত হইয়া মুকুন্দনাথ কহিলেন, “বৎস! তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্। বারুণী বাগ্দত্তা হইয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। এখন তুমি এরূপ নির্দ্দয় হইলে অভাগিনীর দশা কি হইবে?”

হাস্য করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, “আপনার এ বিচিত্র কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। এমন ঘটনা কি আর কোন স্থানে হয় না? পূর্ব্বে যাহার সহিত সম্বন্ধ স্থির হয়, কারণবশে তাহা না হইলে বিবাহ কি চিরদিনের জন্য বন্ধ থাকে?”

“কেবল কথায় সম্বন্ধ ত নয়, আমার জ্যেষ্ঠ মৃত্যুশয্যায় থাকিয়া তোমার হাতে হাতে বারুণীকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন।”

এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় উত্তর করিলেন, “তিনি দিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু আমি কি প্রকারে তাঁহার বাধ্য হইয়া সেই কথা রক্ষা করিতে পারি?”

মুকুন্দনাথ কহিলেন, “বৎস! যদি তুমি সে সময়ে নিজের অনভিমত প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে আর তোমাকে বাধ্য হইতে হইত না। কিন্তু তুমি তৎকালে মৌনভাবে থাকাতে সম্পূর্ণ স্বীকার করাই হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে যে “মৌনং সম্মতি লক্ষণং” বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে অস্বীকার করা কি যুক্তিসঙ্গত হয়?”

কিঞ্চিৎ বিরক্তির স্বরে সুরেন্দ্র কহিলেন, “মহাশয়! আমরা স্বাধীন প্রবৃত্তির পক্ষপাতী। সে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কোন কথা

শুনিলে তাহার অনুমোদন বা সে কথার আদর করা আমাদের মতের বিরুদ্ধ।”

মুকুন্দনাথ আর কোন কথা বলিতেই সাহসী হইলেন না। তাঁহার পক্ষে মহা সঙ্কট উপস্থিত হইল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে অকস্মাৎ গুরুদেবের শুভাগমন হইল। তাঁহাকে দেখিয়া মুকুন্দনাথের অন্তরে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, সুরেন্দ্র অবশ্য গুরুদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী, ইঁহা দ্বারা অনুরোধ করাইলে সুরেন্দ্রের বিবাহে মত হইলেও হইতে পারে। নচেৎ আর কোন আশাই নাই।

মুকুন্দনাথ মনে মনে এইরূপ আশা করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষণপরেই তাঁহার সে আশা দুরাশা বলিয়া বোধ হইল। তিনি দেখিলেন, সুরেন্দ্র গুরুদেবকে প্রণতি না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে করমর্দ্দন পূর্ব্বক ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দনাথ আরও দেখিলেন, গুরুদেব পদপ্রক্ষালন না করিয়া পাদুকাপদেই জলযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব আশা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ঈদৃশ গুরুর অনুরোধে যে কোন বিশেষ ফল দর্শিবে, সে আশা করা দুরাশা।

রাত্রিতে শয়নার্থ একগৃহেই গুরুদেবের ও মুকুন্দনাথের শয্যা বিস্তৃত হইল। মুকুন্দনাথের নিদ্রা নাই, তিনি শয়ন করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কেবল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে গুরুদেব আগ্রহাতিসহকারে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুকুন্দনাথ আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া কুণ্ঠিতস্বরে

কহিলেন, "মহাশয়! এখন আপনিই ভরসা! আপনি অনুরোধ করিলে সুরেন্দ্রের বিবাহে সম্মতি হইতে পারে।"

ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া গুরুদেব উত্তর করিলেন, "আপনার এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করাতে আমি অক্ষম হইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। যদি পাত্রীটীর কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা থাকিত, তাহা হইলেও বরং একবার বলিয়া চেষ্টা দেখিতাম। স্বাধীন প্রকৃতির বিরুদ্ধে হস্তার্পণ করা সভ্য-সমাজের অনুমোদিত নহে।"

মুকুন্দনাথ মনে মনে যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। তাঁহার সকল আশারই শেষ হইল। তিনি জাগ্রত-শয্যায় নিশা যাপন করিয়া প্রভাতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে বিদায় হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

"যথৈব সো হি কিমু তত্র চিন্তনং।
স এব ভর্ত্তা শরণং মমাধুনা॥"

যখন বিপিন বাবু দুর্গাদাস বাবুর বাটী পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তখন তিনি কতিপয় বন্ধুর আগ্রহে তাঁহাদিগের নিকট প্রস্থানের কারণ বলিয়া গিয়াছিলেন। এখন ক্রমশঃ শ্রুতিপরম্পরায় তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এখন সকলেই জানিতে পারিলেন যে, কোনরূপ চিত্তবিকার বশতঃ অথবা চিরবাঞ্ছিত দ্রব্য অপরের ভোগ্য হইবে, সেই হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পলায়ন করেন নাই। যদি সুরেন্দ্রনাথের সহিত স্নেহলতার বিবাহ হয়, তাহা হইলে বাগ্দত্তা অভাগিনী বারুণীর দশা কি হইবে?—তাহার দুর্দ্দশার—দুঃখের আর পরিসীমা থাকিবে না। এদিকে স্নেহলতার হৃদয়েও যেরূপ প্রণয়াঙ্কুর বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছে, তাহাতে সে সুরেন্দ্র ভিন্ন আর কাহারও গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিবে না। সুতরাং উভয় সঙ্কট বিবেচনা করিয়াই বিপিন বাবু সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বিশেষতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিপিন দুর্গাদাসের কে? কেহই নহে। তাঁহার সহিত দুর্গাদাস বাবুর কি সম্বন্ধ?—কিছুই নয়। তিনি দুর্গাদাস বাবুর অন্নে প্রতিপালিত সত্য, কিন্তু বেতনভোগী নহেন। বলিতে গেলে, স্পষ্টই বোধ হয় যে, বিপিন নিঃস্বার্থভাবে দুর্গাদাস বাবুর উপকার করিয়া আসিতেছিলেন।

তিনি বিষয়কর্ম্ম দেখিতেন, বালকবালিকাদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন এবং সমাজ সম্বন্ধীয় কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। উদরান্ন ব্যতীত একদিনের জন্য দুর্গাদাস বাবু বিপিনকে একটী কপর্দ্দক দিয়াও উপকার করেন নাই, কিম্বা ভবিষ্যতে বিবাহ দিয়া সাংসারিক-পাশে আবদ্ধ করিয়া সংসার-সুখে সুখী করিবেন, মুখেও একথা একদিনের জন্যও বলেন নাই। সুরেন্দ্র একদিন ঝটিকার সময় এক মুহূর্ত্তের জন্য স্নেহলতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গৃহিণীকে উপকার-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বিপিন আজন্ম প্রাণপণ করিয়াও তাঁহাদিগের কাহাকেও বিন্দুমাত্র ঋণে ঋণী করিতে পারিলেন না। বাল্যাবধি বিপিনই স্নেহলতাকে লালনপালন করিয়াছেন। আজি স্নেহলতার জ্বর হইয়াছে, আজি তাহার বিকার উপস্থিত, বিপিন কোথায়? বিপিন না হইলে ঔষধ আনয়ন করা হয় না, চিকিৎসক আইসে না, কেই বা স্নেহলতার সেবা-শুশ্রূষা করে? বিপিনকেই সকল কাজ নির্ব্বাহ করিতে হয়। এমন কি, ভীষণ উৎকট রোগে সময়ে সময়ে স্নেহলতাকে ক্রোড়ে লইয়া বিপিন সমস্ত নিশা অনিদ্রায় যাপন করিয়াছেন।

বিপিনের প্রস্থানের কারণ লোকপরম্পরায় গৃহিণীর কর্ণগোচর হইল বটে, কিন্তু তিনি সে কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে, বিপিন স্নেহলতাকে ভালবাসিত, তাহারে না পাইয়া হতাশচিত্তে—নির্ব্বেদসহকারেই চলিয়া গিয়াছে।

গৃহিণী মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আপনিই আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এ সব আলোচনা করাতেও এখন কোন-

রূপ ফল দর্শিতেছে না। এখন সময় অতীত হইয়াছে; এসময়ে একথা স্নেহলতার নিকটে উত্থাপন করাও বৃথা। গৃহিণী মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া স্নেহলতার ভাবগতিক পর্য্যবেক্ষণার্থ মৃদুমন্দপদসঞ্চারে অতর্কিতভাবে তাহার কক্ষের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন।

আজি চপলার মূর্ত্তি গম্ভীর! চিন্তা-তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় সমাকুল! বিবাহের প্রস্তাব হইবামাত্র পিতা গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, কুমারীর হৃদয়ে ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। তাহার উপর আবার বিপিনের প্রস্থান!—যে বিপিনের উপর সমস্ত কার্য্যের ভার বিন্যস্ত, যে বিপিন আজন্ম লালন পালন করিয়া প্রাণাপেক্ষাও স্নেহ করিতেন, সকল মায়া ভুলিয়া—সকল স্নেহ বিস্মৃত হইয়া সেই বিপিনও এসময়ে প্রস্থান করিলেন। এই সকল চিন্তা করিয়া স্নেহলতার কোমল প্রাণ একান্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছে। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্নেহলতা আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "হায়! যদি এ কথা সত্য হয়?—যদি সুরেন্দ্র অন্য প্রণয়িণীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া তাহাকেই রমণীরূপে গ্রহণ করেন?—কি করিব?—তাহা ভাবিয়া কি আমার অন্তঃকরণকে পাপে কলুষিত করিব?—কখনই না, আমি জানি সুরেন্দ্র আমার, আমি এ জীবনে আর কাহাকেও চাহি না। আমি তাঁহাকে মন দিয়াছি, তিনি আমার মন জানিতে পারিয়াছেন, দাদা আমার মনের কথা তাঁহার নিকট লিখিয়াছেন। তিনি জানিয়াছেন, আমি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি। এ মন—এ হৃদয়—এ অন্তর কি আর কখন বিমুখ হয়? তিনি আমাকে না চাহেন, তাহাতে দুঃখ করি না; আমি যাবজ্জীবন

তাঁহাকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিব। তাঁহার রূপ হৃদয় নয়নে দেখিয়া প্রাণ সুশীতল করিব, তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া ছার জীবন যাপন করিব। উঃ! এ কার্য্যে পিতার অমত, আত্মীয় স্বজনেরা প্রতিপক্ষ!—হউন, সে জন্য ভাবিলে কি হইবে? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি যে অঙ্গীকার করিয়াছি, হৃদয়ে যে পণ—যে সংকল্প স্থির করিয়াছি, কিছুতেই তাহা বিস্মৃত হইব না, প্রাণান্তে এ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইব না।"

স্নেহলতা এই বলিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এক দিনের দর্শনেই বিদেশী পুরুষের প্রতি ভালবাসা জন্মিয়াছে দেখিয়া অনেকেই 'দুরন্ত মেয়ে' বলিয়া আমাকে নিন্দা করিতেছে।—করুক্, তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি? সুরেন্দ্রের রূপ আমাকে পাগল করিয়াছে, তাহার রূপেই আমার মন বিমুগ্ধ হইয়াছে। আমি লোকের কথায় প্রকৃত ভালবাসা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আবার শুনিতেছি, অনেকেই বলিতেছে যে, বিপিন এতদিন এত উপকার করিল, তাহার প্রতি স্নেহলতা একবার ফিরিয়াও চাহিল না।—ছি ছি! এ পাপ কথা—এ ঘৃণার কথা শ্রবণ করিলেও পাপ হয়। আমি বিপিনকে দাদা সম্বোধন করি, বস্তুতঃ সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকি, বিপিনও আমাকে ভগ্নীর ন্যায় বিবেচনা করেন্। যাহা হউক, লোকনিন্দায়—লোকের গঞ্জনায় আমি কর্ণপাত করি না। আমি যাহাকে জানিয়াছি,—যাহাকে মন দিয়াছি—যাহাকে ভালবাসিয়াছি, সেই-ই আমার, তিনি ভিন্ন জগতে আমার আর ভালবাসার পাত্র কেহ নাই, কেহ হইতেও পারিবে না।"

স্নেহলতা এইরূপ অনুরাগ-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া আবার করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গৃহিণী অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকলই শ্রবণ করিলেন। সুরেন্দ্রের প্রতি স্নেহলতার এরূপ অনুরাগ দর্শনে তাঁহার অন্তরে যার পর নাই আনন্দ সঞ্চার হইল; কিন্তু কিরূপে শুভকার্য্য সমাধা হয়, সেই ভাবনায় একান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। পতি গৃহে নাই, একমাত্র বিপিন বাবু ভরসা ছিলেন, সে ভরসা—সে আশাও লুপ্ত হইল, চারিদিকে নানারূপ অন্তরায় উপস্থিত। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া অগত্যা সুরেন্দ্রনাথের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

"চিন্তাজ্বরিতচিত্তস্য,
ভ্রমণং পথ্যমেব হি।"

উমানাথ যাহাকে জগতের একমাত্র স্পৃহণীয় রত্ন বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন, যাহা ভিন্ন আর কোন সৌন্দর্য্যই তাঁহার নয়নে প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত না, আজি সেই বারুণী পরের হইল—আর সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী মূর্ত্তি তাঁহার প্রতি ফিরিয়াও দেখিবে না। এই সমস্ত অভূতপূর্ব্ব দৈবগতি পর্য্যালোচনা করিয়া উমানাথ একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শান্তির লেশমাত্রও স্থান পাইল না।

নির্জ্জনে একাকী বসিয়া উমানাথ মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "আর বারুণীর জন্য চিন্তা করিয়া ফল কি? আমি আর বারুণীর জন্য লালায়িত হইব না। সে এখন পরের,—আমার নহে। আমার কেহ নহে সত্য, কিন্তু একবার যখন হৃদয়মন্দিরে স্থান দিয়াছি, তখন কিরূপেই বা একেবারে বিদায় দিই? প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিকে উৎসাদিত করা—তাহাকে স্থানভ্রষ্ট করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি হৃদয়মন্দিরে রাখিয়া চিরদিন সে মূর্ত্তির পূজা করিব। আহা! সেই মনোহারিণী অঙ্গলতিকা, সেই প্রফুল্ল বিম্বাধর—অনতিআয়ত ললাট-প্রদেশ—সুদীর্ঘ কেশপাশ—মনোহর কনককান্তি হৃদয়পটে স্মরণ করিলে জগতের অখিল পদার্থই তুচ্ছ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। কিরূপে তাহা

ভুলিব?—কিরূপে মনকে প্রবোধ দিব?—কিরূপে হৃদয় হইতে সেই মূর্ত্তি অপসারিত করিব? হায়! বুঝিয়াছি, হতবিধি আজীবন দগ্ধবিদগ্ধ করিবার জন্যই উমানাথকে সৃজন করিয়াছেন।”

এইরূপে বিলাপ করিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থান পূর্ব্বক আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উমানাথ বলিলেন, “যে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে জানে,—ভালবাসার জন্য প্রাণ দিতে পারে,—রূপের, সৌন্দর্য্যের বা লাবণ্যের গৌরব বুঝিতে পারে, যদি সেরূপ লোকের হস্তে বারুণীকে সম্প্রদান করা হইত, তাহা হইলেও আমার মনে বরং এরূপ অশান্তির উদয় হইত না। সুরেন্দ্রের হস্তে পড়িবার অগ্রে যদি আমি একদিনের জন্যও বারুণীর সহিত কথা কহিতে পারিতাম,—বারুণী আমাকে ভালবাসে কি না, যদি একবার জিজ্ঞাসা করিতে পাইতাম, তাহা হইলেও অন্তঃকরণে প্রবোধের সঞ্চার হইত; কিন্তু, হায়! তাহা হইল না।—বারুণীও অকূল সাগরে পড়িল, আমিও দুঃসহ দুঃখদাবানলে দগ্ধ হইতে লাগিলাম!”

উমানাথ এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সম্মুখবর্ত্তী দীর্ঘিকার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কিয়দ্দূরমাত্র গমন পূর্ব্বক পশ্চাৎপদ হইয়া আবার পূর্ব্বস্থানে উপবেশন করতঃ কহিলেন, “হায়! কোনরূপেই মনকে প্রশান্ত করিতে সমর্থ হইতেছি না। হৃদয়ে যে বিষম অস্ত্রক্ষেপ হইয়াছে, ইহা প্রতীকারের ঔষধি অতীব দুর্ল্লভ। হায়! বিধাতার এরূপ অবিচার কেন? যে যাহা চায়, যাহার যাহা প্রয়োজন, সে তাহা পায় না কেন?—না, না, বিধাতার অবিচার নহে, তাঁহার দোষ কি? সকলই আমার দুরদৃষ্টদোষে

ঘটিয়াছে। বোধ হয়, জন্মজন্মান্তরে গুরুতর পাপাচরণ করিয়াছিলাম, সেই ফলে এরূপ দুঃসহ নৈরাশ্য ও আনুসঙ্গিক মনস্তাপ সহ্য করিতে হইতেছে।”

এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় প্রপীড়িত হইয়া উমানাথ কিছুদিনের জন্য দেশভ্রমণের সংকল্প করিলেন। বস্তুতঃ ঈদৃশ চিন্তাকুলিতের পক্ষে—ঈদৃশ মানসরোগে বিদেশভ্রমণ একরূপ সুপথ্য সন্দেহ নাই। এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকেই মধ্যে মধ্যে আত্মহত্যা-মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। একান্ত অসহনীয় হইলে—যাতনাতে অধৈর্য্য হইলে দুর্ল্লভ মানবজীবনে অনেকেই বিতৃষ্ণ হয়; সুতরাং যাহাতে অন্তঃকরণে সেইরূপ দুশ্চিন্তা—সেইরূপ অধীরতা—সেইরূপ দুঃসহ যাতনা আক্রমণ করিতে না পারে, যাহাতে সৎসঙ্গ লাভ হয়, সদাচারে ও সদালাপে কালযাপন পূর্ব্বক হৃদয় বিশুদ্ধ হইতে পারে, উমানাথ সেই পথ অবলম্বন করিতে সংকল্প করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"ত্বাং বিনা ন হি জানামি,
শরণং চরণং তব।"

মুকুন্দনাথ বাটী প্রত্যাগত হইলে তদীয় বিমর্ষ বদন দেখিয়া বারুণী সহজেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। অসীম সহিষ্ণুতাবলে ধৈর্য্য সহকারে চিত্তকে দৃঢ়ীভূত করিয়া রাখিলেন। বিশেষতঃ তিনি জীবন-দুঃখিনী, দুঃখকে সহচর করিয়া—চিরদিন দুঃখ ভোগ করিয়া সকল যাতনাই সহ্য করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহার তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতার কারাবাস হয়, তৎপরবৎসরেই পতিশোকে জননী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মুকুন্দনাথের আশ্রমে কন্যানির্ব্বিশেষে বারুণী প্রতিপালিতা হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সে আশ্রমে এরূপ দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ছিল না যে, মাতৃহীনা বালিকা তাহার নিকট এক মুহূর্ত্ত বসিয়া প্রাণ সুশীতল করে। সুতরাং বারুণী যে জীবনদুঃখিনী, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

প্রায় দশবর্ষ এইভাবে সমতীত হইলে যখন বলরাম দীর্ঘ-কারাবাস ভোগের পর পুনর্মুক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, তখন বারুণীর মনে কিয়ৎপরিমাণে সুখের আশা হইয়াছিল। পিতৃপাশে থাকিয়া আদরিণী তিন বৎসর অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু নিদারুণ দৈব বারুণীর সে আশাতরীও অচিরে অতল জলে নিমগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অকস্মাৎ উৎকট রোগে বলরামের

মৃত্যু হইল। আবার বারুণী দুঃখের সাগরে ভাসিলেন। বলরাম মৃত্যুশয্যায় থাকিয়া সুরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া কন্যাকে বলিয়াছিলেন, "মা! আমি মরি, তাহাতে তোমার ভাবনা নাই, তোমাকে যাহা দিয়া যাইতেছি কষ্ট পাইবে না।"

এই সকল পূর্ব্বকথা আনুপূর্ব্বিক বারুণীর হৃদয়পটে সমুদিত হওয়াতে তাঁহার অন্তর যার পর নাই বিচলিত হইয়া উঠিল। সুরেন্দ্রনাথের অভূতপূর্ব্ব আচরণ দর্শনে তাহা চিন্তা করিতে করিতে বারুণী যেন চারিদিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন।

তিনি যথাবিধি পিতৃব্যের সেবা করিয়া পুষ্পোদ্যানের এক প্রান্তে নির্জ্জনে বসিয়া একাকিনী চিন্তা দেবীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার অদৃষ্টচক্র ভাবিতে ভাবিতে অবিরল ধারে তাঁহার নয়নকমল হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। বিধাতা কান্দিবার জন্যই তাঁহাকে সৃজন করিয়াছেন, বাল্যাবধি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে কান্দিতে হইতেছে, কিন্তু যখনই তাঁহার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিত, যখন প্রাণ একান্ত বিচলিত হইত, তখনই ঐরূপ নির্জ্জনে বসিয়া রোদন করিতেন। পাছে কেহ বিরক্ত হয়, পাছে কেহ কোনরূপ কথা বলে, এই প্রকার নানা আশঙ্কায় বারুণী একদিনের জন্যও কাহারও সমক্ষে অশ্রুপাত করেন নাই।

বারুণী যে কি চিন্তায় আকুল হইয়া কান্দিতে বসিলেন, তাঁহার হৃদয় যে কি অভূতপূর্ব্বভাবে সমাকুল হইয়া উঠিল, তাহা তিনি নিজে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। আমিও লেখনীতে তাহা ব্যক্ত করিয়া পাঠকবর্গের নিকট প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম না। বলরাম এত প্রশংসা

করিয়া—এত ভাল বলিয়া যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন, সেই সুরেন্দ্র একদিনের জন্য একবারও বারুণীর দিকে নেত্রপাত করিলেন না। বারুণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,—পরম রূপবতী—সুশীলা এবং তাঁহার অন্তঃকরণ স্বতঃসিদ্ধ সরলতায় বিমণ্ডিত। যে যে গুণ থাকিলে নারীজাতি ভালবাসার প্রকৃত পাত্রী হইতে পারে, বারুণী সেই সেই গুণেই গুণবতী। তবে যে কি অপরাধে সুরেন্দ্র তৎপ্রতি বিমুখ হইলেন, তাহা সেই সুরেন্দ্রই বলিতে পারেন। এরূপ মোহনসুন্দরী ও সর্ব্বগুণবতী হইয়াও বারুণী একদিনের জন্য সৌন্দর্য্যের বা গুণের গরিমা প্রকাশ করেন নাই। তথাপি সুরেন্দ্রনাথ কেন যে এরূপ আচরণ করিলেন, তাহা কে বলিতে পারে?

বারুণী পুষ্পকাননের প্রান্তদেশে নির্জ্জনে একাকিনী বহু বিলাপ ও অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন;—একটী সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস বিসর্জ্জন পূর্ব্বক "হায় যেমন পোড়া কপাল" এই মাত্র উচ্চারণ করিয়া পুনরায় আশ্রমগৃহে প্রবেশ করিলেন।

সুহাসিনী আবার হাস্যমুখে গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবাদিদেব শ্যামসুন্দরের সেবা করিতে বাল্যাবধিই তাঁহার যত্ন ও আন্তরিক প্রীতি ছিল। তিনি গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে বিগ্রহ-সম্মুখে শ্যামকে উদ্দেশ করিয়াই কহিতে লাগিলেন, "শ্যামসুন্দর! যখন তোমার শুশ্রূষায় ত্রুটি হইবে, তখন আমাকে বলিও। আমি যে তোমার চরণে কি অপরাধে অপরাধিনী, তাহা বলিতে পারি না। আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, এখন তোমার চরণই আমার একমাত্র সম্বল।"

মুকুন্দনাথ অদূরে অন্তরালে থাকিয়া বারুণীর এই সকল নির্ব্বেদবাক্য শ্রবণ করিলেন। যখন বারুণী পুষ্পোদ্যানে বসিয়া বিরলে রোদন করেন, তখনও সে মুকুন্দের নেত্রপথে পতিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে মুকুন্দের হৃদয় একান্ত বিচলিত ও শোকে অধীর হইয়া উঠিল। শ্যামসুন্দরের প্রতি বারুণীর ঐকান্তিক ভক্তি দেখিয়া মুকুন্দের হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে সিক্ত হইল বটে, কিন্তু অভাগিনীর বিবাহে নানারূপ বিঘ্ন ভাবিয়া সে আনন্দকে অধিকক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। বাগ্দত্তা কন্যাকে বরান্তরে সমর্পণ করিলে বংশ-মর্য্যাদার লাঘব হইবে ভাবিয়া তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শ্যামসুন্দরকে উদ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভগবন্! আমি আজীবন তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, এখন তোমার ও রাঙ্গা চরণই আমার একমাত্র ভরসা।" এই বলিয়া জড়বৎ একস্থানে মৌনভাবে সমাসীন হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

"হৃষ্টঃ সঃ প্রযযৌ তত্র,
নীত্বা মানসহারিণীং।"

যথাসময়ে গৃহিণীর পত্র সুরেন্দ্রনাথের হস্তগত হইল;—আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পত্রখানি উন্মোচন করিলেন। পত্র পাঠ করিবামাত্র তাঁহার বদন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল, হৃদয় যেন নাচিতে লাগিল। গৃহিণী পত্রপাঠমাত্র সুরেন্দ্রকে দুর্গাপুরে যাইতে লিখিয়াছেন। সুরেন্দ্রও আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া শুভযাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে বিপিনবাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অকস্মাৎ বিপিনকে দেখিয়া সুরেন্দ্র বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে ?"

"হাঁ, আমি প্রায় দুই তিন মাস এখানেই আছি।"

সুরেন্দ্র জানিতেন, দুর্গাদাস বাবুর সংসারে বিপিনই একমাত্র কর্ত্তা, সংসারের যাবতীয় ভারই বিপিনের উপর বিন্যস্ত। বিশেষ এই শুভ বিবাহের প্রবর্ত্তক ও উদ্যোগী একমাত্র বিপিন বাবু। তিনি দুই তিন মাস দুর্গাদাস বাবুর বাটী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন, ইহা যার পর নাই বিস্ময়কর। কোনরূপ বিশেষ নিগূঢ় কারণ না থাকিলে কখনই বিপিনবাবু দুর্গাপুর পরিত্যাগ করেন নাই। এই সকল চিন্তা করিয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রকৃত কারণ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে

বিপিন বাবু কহিলেন, "মহাশয়! আমি কর্ম্মপ্রাপ্তি আশয়েই দুর্গাদাস বাবুর বাটীতে এতাবৎকাল ছিলাম, কিন্তু কর্ম্মের তাদৃশ সুবিধা না হওয়াতে অগত্যা সে স্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।"

বিপিনের উত্তর সুরেন্দ্রের মনোমত হইল না। সুরেন্দ্র সে কথায় তাদৃশ বিশ্বাস না করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, বিপিন কোন বিশেষ কারণে দুর্গাদাস বাবুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মনে মনে এইরূপ তর্কবিতর্ক করিয়া অধিকতর আগ্রহ সহকারে পুনরায় বিপিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বিপিন সুরেন্দ্রের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে কহিলেন, "মহাশয়! আপনি পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়াই আমি প্রকৃত কারণ বলিতেছি শ্রবণ করুন্। কিন্তু সে কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিলে যদি ভবিষ্যতে কোনপ্রকারে কাহারও অনিষ্ট হয়, তজ্জন্য আমি অপরাধী হইব না।"

বিপিন বাবু এই বলিয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা বিবৃত করিলে, সুরেন্দ্র ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থান পূর্ব্বক মৃদুহাস্যে কহিলেন, "মহাশয়! আমি তজ্জন্য কোন ভয় করি না, আমি স্বাধীন প্রবৃত্তির অনুগামী। আপনি কি পরের কথায় বিষপান করিতে ইচ্ছুক হয়েন? আমার জীবনের সুখ দুঃখের জন্য আমিই দায়ী, যে পথে যাবজ্জীবন সুখে কালাতিপাত হয়, সেই পথের অনুসরণ করাই আমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।"

সুরেন্দ্র এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে বিপিন আর সে সম্বন্ধে কোন আন্দোলন করিলেন না। অনন্তর অন্যান্য কথায়

কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে সুরেন্দ্রনাথ সাদরসম্ভাষণে বিদায় লইয়া পুনরায় দুর্গাপুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

যথাকালে ছদ্মবেশে—অতিথিবেশে সুরেন্দ্রনাথ দুর্গাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে বহির্বাটিতে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা কেহই সুরেন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিল না, অতিথি বলিয়াই উপলব্ধি করিল। অন্তঃপুরে অতিথি আগমনের সংবাদ প্রদত্ত হইলে গৃহিণী বহির্বাটিতে আসিলেন। তিনি দেখিবামাত্র সুরেন্দ্রকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু অপর লোকের সমক্ষে আত্মভাব গোপন পূর্ব্বক অতিথিরূপে সুরেন্দ্রকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন।

যথাকালে আহারের আয়োজন হইল। সুরেন্দ্র অন্তঃপুরে আহারার্থ গমন করিলেন। আহার সমাপনান্তে গৃহিণী নির্জ্জনে সুরেন্দ্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "বাবা! আমি যে জন্ত তোমাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। এখানে তোমাদের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইবে না। তোমার শ্বশুর কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, একমাত্র বিপিনের উপর সকল কার্য্যের ভার ছিল, কিন্তু কি কারণে যে সেই বিপিন এস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। যাঁহারা জ্ঞাতি—আত্মীয় বন্ধু, তাঁহারা এ বিবাহে একপ্রকার ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন; কিন্তু আমি সর্ব্বথা কর্ত্তব্যজ্ঞানেই তোমার হস্তে আমার স্নেহলতাকে সমর্পণ করিতেছি। আমার এ প্রতিজ্ঞা স্থির—অটল। আমি মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়াছি যে, গঙ্গাস্নানের ছলে স্নেহ-

লতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কালীঘাটে যাই, সেই স্থানেই তোমাদের শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হউক্।"

গৃহিণীর বাক্যে সুরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। তখন গৃহিণী গঙ্গাস্নান-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি কি উদ্দেশে কোথায় যাইতেছেন, কেহই তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিল না। সমস্ত আয়োজন হইলে সুরেন্দ্রনাথ, গৃহিণী ও স্নেহলতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মনের হরিষে কালীঘাট উদ্দেশে শুভযাত্রা করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

K. B. ROY SOLE PROPRIETOR 1898.

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোয়মনতি বিচিত্র।"

কালীঘাট,—হিন্দুদিগের পরম পবিত্র পীঠতীর্থ। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, এইস্থানে ভগবতী মহামায়া দেবীর কনিষ্ঠাঙ্গুলী বিষ্ণুচক্রে কর্ত্তিত হইয়া নিপতিত হইয়াছিল। মন্দিরের অনতিদূরেই নাতিপ্রশস্তা পতিতপাবনী আদিগঙ্গা বিরাজমানা। আজি মহাযোগ উপলক্ষে অসংখ্য যাত্রী-সমাগমে তীর্থক্ষেত্র সমাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গঙ্গাতীর লোকারণ্য। কেহ প্রফুল্লহৃদয়ে পতিতপাবনীর পবিত্রনীরে অবগাহন করিয়া আত্মাকে নিষ্কলুষ জ্ঞানে পরমানন্দ লাভ করিতেছেন, কেহ বা মুদিতনয়নে তীরভূমে বসিয়া অভীষ্টদেবের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন, কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে সিক্তবস্ত্রেই আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন, আবার কেহবা ববম্ ববম্ শব্দে গালবাদ্য ও কণ্ঠবাদ্য করিয়া অনাদিনাথ শিবার্চ্চনার ঘোরঘটা প্রকাশ করিতেছেন। ফলতঃ সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ, সকলেরই মুখশ্রী বিকসিত—কোকনদবৎ প্রফুল্ল। এত আনন্দ—এত আমোদ—এত উল্লাস, তথাপি একটী কিশোর-বয়স্কা অনূঢ়া কামিনী বিরসবদনে নীরবে বসিয়া রোদন করিতেছেন, নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। ক্ষণকাল পরে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেই অভাগিনী বলিয়া উঠিলেন, "হায়! বাবা কাশীযাত্রা করিয়া এই তীর্থ পর্য্যন্ত আসিয়া-

ছিলেন, এই জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই হতভাগিনীর জন্যই আবার তাঁহাকে স্বগৃহে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।”

পাঠকগণ বোধ হয়, এখন এই কামিনীকে চিনিতে পারিয়াছেন। ইনি অপর কেহই নহেন,—আমাদিগের চিরদুঃখিনী বারুণী! বারুণী মহাযোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য পিতৃব্য মুকুন্দের অনুমতি লইয়া প্রতিবাসিনীগণের সহিত আগমন করিয়াছেন। কালীঘাট আসিয়া পিতার কথা স্মৃতিপটে সমুদিত হওয়াতে তাঁহার দুঃখসাগর সমুদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, সেই জন্যই তিনি অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে সমর্থ হন নাই।

ক্ষণকাল নীরবে রোদন করিয়া বারুণী ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক জাহ্নবীসলিলে অবগাহন করতঃ নির্দ্দিষ্ট আবাসাভিমুখে গমন করিলেন। অকস্মাৎ পথিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নয়ন-পথে নিপতিত হইলেন। বারুণী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গমন করিতে-ছেন, সুরেন্দ্র তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাতও করেন নাই, কিন্তু বারুণী দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। সুরেন্দ্র যেরূপ আচরণই করুন না কেন, বারুণী তাঁহাকেই হৃদয়মন্দিরে অভীষ্ট-দেবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিবামাত্র বারুণীর হৃদয় যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি অবগুণ্ঠনাভ্যন্তর হইতে দেখিলেন, সুরেন্দ্রনাথ অনতিদূরে একটী দ্বিতল বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

যে বাটীতে বারুণী ও তাঁহার সমভিব্যাহারীগণ অবস্থান করিতেছেন, তথায় আরও অনেকগুলি যাত্রীর বাসা। সকলেই পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে স্ব স্ব দলে বেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে যিনি পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তিনিও ঐ বাটীতে আপনার আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বারুণীর কক্ষের সংলগ্ন পার্শ্ববর্ত্তী গৃহেই তাঁহার বাস। তিনি বৃদ্ধ—জরাজীর্ণ—পলিতকেশবিশিষ্ট ও বিলক্ষণ সুপণ্ডিত। তাঁহার আকৃতি দর্শনেই বিশুদ্ধভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজ কক্ষে বসিয়া কতিপয় আত্মীয়ের নিকট সুরেন্দ্রের বিবাহসম্বন্ধীয় কথার আন্দোলন করতঃ সুরেন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন, অকস্মাৎ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বারুণীর কর্ণে সেই সকল কথা প্রবেশ করিল। তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ করিয়া স্পষ্টই জানিতে পারিলেন যে, সেই দিনেই এই কালীঘাটেই স্নেহলতার সহিত সুরেন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে। শ্রবণমাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীর স্বেদজলে অভিষিক্ত হইল, মস্তক যেন চারিদিকে বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি আত্মহারার ন্যায় একস্থানে নীরবে উপবেশন করিয়া করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক চিন্তানিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

এই ভাবে কতক্ষণ অতিবাহিত হইল, বারুণী তাহা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি যেন এতক্ষণ হতচেতনার ন্যায় অবস্থিত ছিলেন ; এখন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার সমস্ত ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, হাস্যের মধুময়ী বিজলি তাঁহার অধরপ্রান্তে শোভা পাইতে লাগিল। অভূতপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য যেন তাঁহার মুখমণ্ডল বিরাজিত করিল। তিনি যেন আজি মহাষ্টমীর মহামায়ার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

সহসা বারুণীর এ ভাব হইল কেন? পিতার মৃত্যুর পর হইতে নানাবিধ বৈরাগ্যনিবন্ধন যে বারুণী একদিনের জন্যও আনন্দের হাস্য করেন নাই, যে বারুণী একদিনের জন্যও কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথোপকথন করেন নাই, সুরেন্দ্রের ব্যবহার দর্শনে যে বারুণী জীবন্মৃতার ন্যায় হইয়াছিলেন, আজি হঠাৎ কি কারণে সেই বারুণী এত প্রফুল্লা—এত আনন্দময়ী, তাহা তাঁহার সমভিব্যাহারীগণ কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিল না। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে বারুণী গঙ্গাতীরে বসিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ত্রিলোকতারিণী জগন্মাতার স্রোতবৃদ্ধি করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ তাঁহার ঈদৃশী প্রফুল্লতার কারণ কি? সুরেন্দ্রের বিবাহের কথা শুনিয়া বরং দুঃখ সঞ্চারেরই সমূহ সম্ভব। স্নেহলতার সহিত বিবাহ হইয়া গেলে বারুণীকে চিরজন্মের মত সুরেন্দ্রের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এ অবস্থায় কেন যে বারুণী আজি এরূপ আনন্দে আনন্দময়ী, তাহা সেই ত্রিতাপহারিণী দেবী আনন্দময়ীর অন্তরেই নিহিত আছে।

স্নান পূজা প্রভৃতি উপলক্ষে এতক্ষণ সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। এখন আহারের আয়োজন হইল। সকলেই প্রফুল্লমনে আহার করিলেন, কিন্তু বারুণী শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রকাশ পূর্ব্বক উপবাসী রহিলেন। বিশেষতঃ, পাছে কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় কেহ তাঁহাকে আহারার্থ বিশেষ অনুরোধ করিল না।

বারুণী স্বীয় শয্যাতলে শয়ন করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে দুইটী সমবয়স্কা কামিনী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নানারূপ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। বারুণীর কোমল অর-

বিন্দোপম মুখশ্রী দেখিয়া—তাঁহার অমৃতময়ী বচনাবলী শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, সকলেই তাঁহার নিকট আসিয়া নানাকথায় সময়াতিপাত করিত।

কথাপ্রসঙ্গে বারুণী বলিলেন, "আজি এই পাড়াতে একটী বিবাহ আছে। শুনিয়াছি, বর কন্যা উভয়েই যেন রূপে গুণে হরগৌরী।"

এই কথা শুনিবামাত্র আগন্তুক রমণীদ্বয়ের একজন কহিল, "দিদি, আমি এদেশের বিবাহ কখনও দেখি নাই, দেখিতে ইচ্ছা হয়।"

বারুণী কহিলেন, "বেশ ত, আমিও দেখিতে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি; সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে গেলেই দেখিতে পাইবে।"

বিবাহ দেখিতে যাইবার কল্পনা স্থির করিয়া সমবয়স্কা কামিনীদ্বয় নিজকক্ষে প্রস্থান করিলে বারুণী চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিলেন;—দেখিতে দেখিতে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন শ্বেতশ্মশ্রু জটাজূটমণ্ডিত অক্ষমালাবিভূষিত ভস্মত্রিপুণ্ড্রকধারী জনৈক সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক বলিতেছেন, "মা! তুমি যাহা মনে মনে চিন্তা করিয়াছ, যেরূপ চিন্তা করিয়া আজি মনের আনন্দে প্রফুল্লবদনে বেড়াইতেছ, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মের সোপান। এই বিশ্বরাজ্যে যাহা কিছু নেত্রগোচর হয়, সকলই অসার। এই অসার ভোগ্যবস্তুতে জলাঞ্জলি দিয়া নশ্বর দেহাদিতে আশক্তি পরিহারপূর্ব্বক কায়মনে পরমপথের পথিক হইলেই আর পরিণামে ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। নারীজাতির মন স্বভাবতঃ

কোমল, সহজেই পরিবর্ত্তিত ও বিচলিত হয়, কিন্তু তোমার চিত্তদার্ঢ্য দেখিয়া যার পর নাই চমৎকৃত হইয়াছি। তুমি সুরেন্দ্রকেই পতিজ্ঞান করিয়া হৃদয়ে তাঁহারই চরণ ধ্যান করিতেছ, সুরেন্দ্রের দেবমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া সংসার বিসর্জ্জন দিয়া গহনকন্দরে দেহপাতের কামনা করিয়াছ, ইহাতে তোমার সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতেছে। তুমি ইহজন্মে সুরেন্দ্রকে পাইবে না সত্য, কিন্তু মা! দুঃখিত হইও না, পরলোকে সুরেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া নিত্যসুখে সুখিনী হইবে সন্দেহ নাই।”

স্বপ্ন দেখিবামাত্র বারুণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে স্বপ্নে এই সকল প্রবোধবাক্য প্রদান করিল, তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু কথাগুলি যেন অবিকল তাঁহার পিতা বলরামেরই কণ্ঠস্বর বোধ হইল। সেই স্বর শ্রবণে পিতার কথা মনে জাগরুক হওয়াতে আবার তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল; কিন্তু ক্ষণপরেই ধৈর্য্যসহকারে আত্মসংযম পূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে বিবাহ দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"পশ্য পশ্য বরারোহে মিলনং সুমনোহরং।
শোভতে পরমাদ্ভুতং লক্ষ্মীনারায়ণাবিব॥"

মহামায়ার মন্দিরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে রাজপথের উপরেই এক-ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকা। বাটীখানির দ্বারদেশে কদলীতরু, পূর্ণ-কুম্ভ ও আম্রপল্লবাদি মঙ্গল দ্রব্য বিরাজিত। দেশীয় প্রথা অনুসারে একদল নহবতবাদ্য মধুর ধ্বনিতে শুভবিবাহের ঘোষণা করিয়া দিতেছে। বাটীর চতুর্দ্দিক্ আলোকমালায় সুশোভিত, কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের বিরলতা বশতঃ তাদৃশ আড়ম্বর বা বিশেষ কোনরূপ গোলমাল লক্ষিত হইতেছে না। পাঠক মহা-শয়েরা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, এই বাটীতেই স্নেহলতার সহিত সুরেন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইতেছে।

যথাবিধানে বহ্নি সমক্ষে সম্প্রদানক্রিয়া সমাহিত ও স্ত্রীয়াচা-রাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে বর-কন্যা বাসর-গৃহে প্রবে-শোন্মুখ হইয়াছেন, ইত্যবসরে কয়েকটী রমণী বিবাহ দর্শনেচ্ছু হইয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। স্নেহলতার জননী তাঁহা-দিগকে দর্শনমাত্র পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে একটী ষোড়শবর্ষীয়া কামিনী কলকণ্ঠবিনিন্দিত মধুর ধ্বনিতে কহিলেন, "মা! আমরা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এখানে আসিয়াছি, এই পল্লীতেই আমাদিগের বাসা। বিবাহের কথা শুনিয়া বর কন্যা দর্শনের বাসনায় উপস্থিত হইয়াছি।"

গৃহিণী রমণীর অনুপম দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া—তাঁহার মধুময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া বিমোহিত প্রায় হইয়া পড়িলেন। ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "মা! যখন তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমার স্নেহলতার বিবাহ দেখিতে আসিয়াছ, তখন অদ্য নিশি বাসরগৃহে থাকিয়া আমোদ-প্রমোদ করিলে পরম উপকৃতা হইব। আমিও বিদেশী, এখানে আত্মীয়ের জন তাদৃশ নাই। তোমাদিগকে দেখিয়াই সম্ভ্রান্তগৃহের কন্যা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।"

পাঠকগণ! যাঁহার সহিত গৃহিণীর কথোপকথন হইতেছে, তিনিই আমাদিগের অভাগিনী বারুণী। বারুণী গৃহিণীর অনুরোধে সম্মতা হইয়া তৎক্ষণাৎ সমভিব্যাহারিণীগণের সহিত বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বাসরগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক স্নেহলতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বসাইলেন, অনতিদূরেই সুরেন্দ্র অধোমুখে অবস্থিত। অবগুণ্ঠন থাকাতে যামিনীযোগে তিনি বারুণীকে কোনমতেই চিনিতে পারিলেন না। বারুণী স্নেহলতাকে ক্রোড়ে লইয়া ঘন ঘন সাদরে মুখচুম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগিনি! সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবিনী হও।"

স্নেহলতা আদরমাখা কথা শুনিয়া পুনঃপুনঃ বারুণীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "দিদি! আপনি কে? আমি ত আপনাকে চিনিতে পারিলাম না। আপনার মধুমাখা কথা শুনিয়া যেন পরম আত্মীয় বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

হাস্য করিয়া—চিবুক ধারণ করিয়া বারুণী বলিলেন, "ভগিনী! বিশ্বপিতার এই অসীম বিশ্বরাজ্যে কি কেহ কাহারও পর

আছে?—সকলেই সকলের আত্মীয়। তোমার লাবণ্যবিজড়িত মুখপদ্মখানি দেখিয়া আমার হৃদয় যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। তোমার ন্যায় সুন্দরী ও শীলবতী বালিকা জগতে অতীব দুর্লভ। তোমাকে দেখিয়াই ভাল বাসিয়াছি,—সহোদরার ন্যায় স্নেহ পড়িয়াছে, সেই জন্যই ঈশ্বরের নিকট তোমাদিগের মঙ্গলকামনা করিতেছিলাম।"

এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যেই এরূপ অনুরাগ ও প্রীতি জন্মিল যে, স্নেহলতা বারুণীকে যেন প্রকৃত জ্যেষ্ঠা সহোদরা বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যদিও বারুণী অবগুণ্ঠনাভ্যন্তর হইতে মৃদু মধুর বাক্যে স্নেহলতার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তথাপি সেই সমস্ত কথাই সুরেন্দ্রের শ্রুতিমূলে প্রবেশ করিল। উন্মুখযৌবনা কামিনীর মুখে উপদেশপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি পরিচয় জানিবার জন্য একান্ত সমুৎসুক হইয়া স্নেহলতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "স্নেহলতে! তোমার দিদির কি পরিচয় শুনিতে পাই না?"

মৃদু মধুর হাস্য করিয়া বারুণী স্নেহলতাকে কহিলেন,—"ভগিনি! তোমার বর আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? পুরুষে কি ইচ্ছা করিলেই রমণীর পরিচয় পায়? তোমার বরকে বল, আমি গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কালীঘাটে আসিয়াছি, বিবাহ দর্শনে ইচ্ছা হইল, সেই জন্য তোমাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছি।"

সুরেন্দ্র আর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের কথায় ক্রমে রাত্রি অবসান হইতে

লাগিল। তখন স্নেহলতা বারুণীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দিদি! তুমি আর কতদিন কালীঘাটে থাকিবে?"

"এক সপ্তাহ তীর্থে বাস করাই সকলের সঙ্কল্প আছে। অদ্য ছয় দিন, বোধ হয়, আগামী পরশ্ব আমরা এ স্থান পরিত্যাগ করিব।"

বারুণীর এই কথা শুনিয়া স্নেহলতা পুনরায় কহিলেন, "দিদি! তবে তুমি কালি একবার আমাদের বাটীতে আসিবে? আমরাও পরশ্ব বুধবার এস্থান হইতে চলিয়া যাইব। আর ত এমন দিদির সাক্ষাৎ পাইব না।"

"আসিব।" এই কথা বলিয়া বারুণী স্নেহলতাকে পুনঃপুনঃ সাদরে চুম্বনপূর্ব্বক সমভিব্যাহারিণিগণসহ আপনাদিগের বাসা বাটীতে প্রস্থান করিলেন। দেখিতে দেখিতে নবদম্পতীর শুভ বাসরের রাত্রি অবসান হইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"অনিত্যে সংসারে ঘোরে,
সারং তৎপদমুত্তমম্।"

আজি বুধবার। মঙ্গলবারের নিসাবসানে বুধের প্রাতঃকালে শুভক্ষণে নবদম্পতী বিধানানুসারে শুভ যাত্রা করিয়া রহিয়াছেন। বেলা সাড়ে নয় ঘটিকার সময় শকটারোহণে সুরেন্দ্রনাথ নববধূ লইয়া স্বদেশে শুভযাত্রা করিবেন। সমস্ত আয়োজন স্থিরীকৃত হইয়াছে। মনের আনন্দে নবদম্পতীর মুখপদ্ম প্রফুল্ল সরোজবৎ বিকসিত।

এদিকে বারুণী ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে আদিগঙ্গায় স্নান করিয়া বাসাবাটীতে আগমনপূর্ব্বক দেবার্চ্চনা প্রভৃতি সৎকার্য্যে মঙ্গলবার অতিবাহিত করিলেন। আজি বারুণীর মুখশ্রী অভূতপূর্ব্ব লাবণ্যে বিমণ্ডিত। স্বর্গীয় তেজ—স্বর্গীয় মাধুরী যেন তাঁহার বদনপদ্মে প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহার তৎকালীন সুষমা দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইল যেন, তাঁহার হৃদয়মন্দির আনন্দনীরে সংপ্লাবিত হওয়াতে উচ্ছ্বলিত হইয়া বহির্ভাগে বিকাশিত হইয়া পড়িতেছে। ভ্রষ্টরাজ্য নরপতি হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে যেরূপ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন, যুগপ্রায় দীর্ঘপ্রবাসী পতির শুভাগমন হইলে বিরহিণী পত্নীর হৃদয় যেরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, দীর্ঘকাল উৎকট পীড়াভোগের পর প্রথম অন্ন পথ্য প্রাপ্ত হইলে তৎকালে রোগীর মুখপদ্ম যেরূপ অভিনব শ্রী ধারণ করে, আজি

যেন বারুণীর কনককমলবিনিন্দিত বদনচন্দ্রমায় সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় চন্দ্রিমা বিরাজ করিতে লাগিল।

আজি বারুণীর এত আনন্দ কেন, কেন আজি তাঁহার হৃদয়পদ্ম এত বিকসিত, পাঠকগণ বোধ হয় তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। বারুণী আজি অখিল সংসারকে প্রকৃত অসার বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, আজি তাঁহার চক্ষে জগৎ কুটুম্বময় বলিয়া অনুভূত হইতেছে, আজি পাষাণে কাঞ্চনে তাঁহার সমবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। শৈশবাবধি পিতৃব্য মুকুন্দনাথের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইয়া—নিরন্তর শ্যামসুন্দরের সেবা করিয়া—অহরহ সদনুষ্ঠানের আচরণ দর্শন করিয়া বারুণীর হৃদয় চিরদিনই পবিত্রভাব ধারণ করিয়াছিল, তাঁহার ঐকান্তিকী মতি ধর্ম্মপথেই একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছিল, বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মাচরণের বলে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও উত্তরোত্তর সুমার্জ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু এতদিন একদিনের জন্যও সংসারবাসনা তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় নাই। সুরেন্দ্রকে পতিলাভ করিবেন, হৃদয়ে পতিদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃত সাত্ত্বিক প্রেমপুষ্পে পতিপদ পূজা করিয়া মানবীয় জীবন সফল করিবেন, মূর্ত্তিমান্ পতিদেবকে অহরহ দেখিয়া নয়ন মন সার্থক করত অতুল সুখে সুখিনী হইবেন, এই আশা ধরিয়াই এতদিন বারুণী আপন জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, কিন্তু আজি তাঁহার সে ভাব—সে চরিত্র—সে অভিসন্ধি সকলই যুগপৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যখন স্পষ্টই দেখিলেন যে, এ জীবনে আর সুরেন্দ্রকে পাইবার আশা নাই, সুরেন্দ্র ব্যতিরেকেও জগৎ অসার, তখন সে শূন্যময় সংসারে কোন্ আশার প্রত্যাশী হইয়া

থাকিবেন? যাহাকে পতিজ্ঞানে অবিচারিত মনে আত্ম সমর্পণ করিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছেন, যদি তাঁহার পদকমল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অসার সংসার-মায়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরমপিতার চরণপদ্মে আত্মনিবেশ করিতে পারেন, তাহা হইলে আর ভববন্ধনে বন্দীভূত হইতে হইবে না; অধিকন্তু পরলোকে সময়ে সেই আরাধ্য পতিকে প্রাপ্ত হইয়া নিত্যধামে নিত্যসুখে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। এই সকল চিন্তা করিয়া আজি বারুণী সংসারকে কেবল ঐন্দ্রজালিক মায়াজ্ঞানে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দিব্যতেজে তেজস্বিনী ও অনির্ব্বচনীয় সুষমায় বিরাজিত হইলেন। মনে মনে কল্পনাবলে স্বীয় অভিসন্ধি স্থির করত মঙ্গলের নিশা অতিবাহিত করিলেন।

প্রভাতে বাসাবাটীর সকলে পূর্ব্ব পূর্ব্বদিনের ন্যায় জাহ্নবী-সলিলে স্নানার্থ গমন করিলেন; কিন্তু বারুণী সে দিন তাঁহা-দিগের সমভিব্যাহারে না গিয়া বাসাতেই রহিলেন। সকলে স্নানার্থ প্রস্থান করিলে বারুণী আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া একপ্রকার নবীনবেশ ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্নেহলতার নিকট গমন করিলেন। থিড়কিদ্বার দিয়া একেবারে স্নেহলতার কক্ষে গমন করিবামাত্র স্নেহলতা চমকিয়া উঠিলেন;—বিকাসিত নয়নে বারুণীর দিকে অনিমেষে দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্র-পুত্তলিকাবৎ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে আর বাক্য-মাত্রও স্ফূরিত হইল না। তিনি দেখিলেন, যাঁহাকে বাসরগৃহে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, যিনি আদরমাখা কথায় কোলে লইয়া কত ভালবাসা জানাইয়াছিলেন, আজি সেই রমণী অভূত-পূর্ব্ব নবীনা তপস্বিনী-বেশে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া-

ছেন। তাঁহার পরিধান গৈরিক বসন, হস্তে অক্ষবলয়, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা এবং ললাটে সিন্দূরবিন্দু বিরাজমান। তাঁহাকে দেখিলেই তাপসীবেশী মূর্ত্তিমতী গৌরীদেবী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাসরের রাত্রিতে তাঁহাকে যেরূপ সুন্দরী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, আজি যেন তাপসীবেশে তদপেক্ষা শতগুণে রূপের ছটা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার হস্তে একটী কাচের ক্ষুদ্র বাক্স।

অকস্মাৎ এইরূপ অনির্ব্বচনীয় নববেশ দর্শনে বিস্মিত হইয়া স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! একি?—আজি তোমার এ বেশ কেন?"

"কেন ভগ্নি! এ বেশ কি ভাল নয়?—ইহাতে কি ভাল দেখাইতেছে না?"

মৃদু হাস্য করিয়া স্নেহলতা কহিলেন, "দিদি! প্রকৃত সুন্দরী যে সাজেই সাজুক না কেন, অনির্ব্বচনীয় মধুময় শোভা ধারণ করে। এ বেশে যে তোমার কি মনোহারিণী শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু এ বেশ কেন?"

"তাহা পরে শুনিবে"—এই কথা বলিয়া বারুণী স্নেহলতাকে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক মুখ চুম্বন করত উপবেশন করিলেন। পরে ধীরে ধীরে বাক্সটী উন্মোচন করিলে স্নেহলতা দেখিলেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি মূল্যবান্ স্বর্ণালঙ্কার বিরাজিত রহিয়াছে। বিবাহের দিন বাসরগৃহে ঐ সকল অলঙ্কার বারুণীর দেহে শোভিত ছিল। বারুণী ধীরে ধীরে এক একখানি করিয়া সমস্ত অলঙ্কারগুলি স্নেহলতার অঙ্গে পরাইয়া দিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে স্নেহলতা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "দিদি! একি? এসব আমার গায়ে পরাইতেছ কেন?"

Rebecca's parting gifts to Rowena, wife of Ivan-hoe.

"ভগ্নি! তোমাতে আমাতে কি ভেদ আছে? তুমি আমার ভগ্নী, তোমার অঙ্গে দিলে যেরূপ আনন্দ বোধ করিব, নিজের অঙ্গে দিলে কি কখনও সেরূপ প্রীতিলাভ হয়? এ সামান্য অলঙ্কার, ভগ্নীপ্রদত্ত অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যে ঘৃণা না করিয়া চিরদিন অঙ্গে পরিও আর এক একবার তোমার এই দিদিকে স্মরণ করিও, তাহা হইলেই পরম সুখী হইব।"

ক্রমে স্নেহলতা অধিকতর বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটীমাত্রও বাক্য নির্গত হইল না। তিনি অনিমেষ-নয়নে বারুণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বহির্বাটীতে থাকিয়া শুভযাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন। সহসা স্নেহলতাকে ত্বরাপ্রদর্শনার্থ তদীয় কক্ষে গমন করিলেন। অনতিদূর হইতে তাঁহার পদশব্দ শ্রবণে বারুণী গৈরিক বসনে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া রহিলেন। তখন সুরেন্দ্র গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক স্নেহলতার গাত্রে অলঙ্কার দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নেহলতে! এ কি? এ সকল নূতন ভূষণ কোথায় পাইলে?"

মধুরগুঞ্জনে স্নেহলতা কহিলেন, "দিদি এ গুলি আমার অঙ্গে পরাইয়া দিলেন।"

সুরেন্দ্র তচ্ছ্রবণে বিস্মিত হইয়া বারুণীর দিকে নেত্রপাত-পূর্ব্বক গৈরিক বসন পরিধান দর্শনে কোনই কারণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নেহলতে! তোমার দিদির ন্যায় এরূপ দয়াবতী ও স্নেহবতী রমণী আর কুত্রাপি দেখিতে পাই না। জগতে ঈদৃশী রমণীই একমাত্র ধন্যবাদের পাত্রী। কিন্তু ইনি আজি কি দুঃখে গৈরিকবসনে পরিবেষ্টিত হইয়াছেন?"

তখন বারুণী মৃদু মৃদু স্বরে কহিলেন, "যাহা যাহার প্রিয়, সে তাহাই গ্রহণ করে। তুমি নবীন প্রেমিক যুবক, স্নেহলতা জগৎসুন্দরী নবীনা যুবতী, তোমার প্রণয়ের পাত্রী—ভালবাসার পাত্রী বলিয়াই তুমি স্নেহলতাকে গ্রহণ করিয়াছ। সেইরূপ এই গৈরিক বসনই আমার প্রিয়, এই বসনই আমার মত নারীর উপযুক্ত, সেইজন্যই আমি ইহা পরিধান করিয়াছি। এখন আমার একটী ভিক্ষা আছে। একবার স্নেহলতাকে বামে রাখিয়া উপবেশন কর, আমি যুগলমিলন দেখিয়া জীবন সার্থক করি।" এই বলিয়া স্নেহলতাকে স্থরেন্দ্রের বামপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া বারুণী অনতিদূরে স্থরেন্দ্রের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মানা হইয়া মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন।

অত্যুজ্জল তেজোময়ী মূর্ত্তি! আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নকমল যেন দ্বিগুণ আয়ত হইয়া অনিমেষে স্থরেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।—যেন শতসূর্য্যদীপ্তি সেই বিশাল নয়নে সমুদ্ভাসিত। স্থরেন্দ্র অকস্মাৎ যেমন সেই মূর্ত্তির দিকে নেত্রপাত করিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণ চমকিত ও শিহরিয়া উঠিল।—দেখিলেন, এ মূর্ত্তি আর কেহই নহে, বলরাম মৃত্যুকালে যাঁহাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, এ সেই চিরদুঃখিনী বারুণী। যাঁহাকে একপ্রকার আশ্বাস দিয়া—সম্মুখে স্থশোভনা আশাতরী দেখাইয়া আবার সেই আশ্বাসে নিরাশ করেন, সেই আশাতরী নিজেই অতল জলে নিমগ্ন করিয়া দেন, এ সেই সরলা শান্তপ্রকৃতি প্রেমাত্মিকা বারুণী। তখন বারুণীর চক্ষে চক্ষুপাত হইবামাত্র—নয়নে নয়ন মিশ্রিত হইবামাত্র স্থরেন্দ্রের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, হৃদয় ব্যথিত হইল, নেত্রকমল অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ

হইয়া উঠিল; আর ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া বাষ্পগদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বারুণি!"

পার্শ্বকক্ষেই স্নেহলতার জননী ছিলেন, অকস্মাৎ তিনি সুরেন্দ্রের মুখনির্গত "বারুণী" ধ্বনি শ্রবণমাত্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বারুণী নাম গৃহিণীর নিতান্ত অপরিচিত নহে! তিনি পরম্পরায় বলরামের কন্যা বারুণীর নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে সুরেন্দ্রের সহিত ইতিপূর্ব্বে যে যে ঘটনা হয়, তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি গৈরিক বসনাবৃতা কামিনীকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

বারুণীর নেত্রযুগল নীহারসিক্ত কমলদলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি গদগদকণ্ঠে সুরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! তুমি অধীনীকে পামরী জ্ঞানে চরণে স্থান দিলে না, আমি তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নহি। আমি চিরদিন তোমার চরণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব। এ জীবনে আর কেহই এ হৃদয়ে স্থান পাইবে না। আমি অনিত্য অসার সংসার-মায়ায় বন্দী থাকিতে ইচ্ছা করি না। যদি তোমার পদ ধ্যান করিয়া,—তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গহন কাননে বা গিরিকন্দরে দেহপাত করি, তাহাও আমার পক্ষে পরম সুখকর বোধ হইবে। স্বামিন্! আর আমার গৃহে কি কাজ?—পিতৃব্যের আশ্রমেই বা কি প্রয়োজন? এখন ভূমিতলই আমার শয্যা,—দিক্‌ই আমার বসন,—ত্বৎপদধ্যানই আমার নিত্যব্রত এবং গিরিকন্দরই পরম রমণীয় আশ্রম। জগদীশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি, তুমি স্নেহলতাকে লইয়া পরম

সুখে সুখী হও; কিন্তু নাথ! এই ভিক্ষা, যেন আমার মত প্রাণের স্নেহলতাকে ভ্রমেও অকূল পাথারে ভাসাইও না।”

বারুণী এইমাত্র বলিয়া দ্রুতপদে তৎক্ষণাৎ খিড়কি দ্বার দিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহিণী, সুরেন্দ্র ও স্নেহলতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে যেন তাঁহাদিগের চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহারা নানারূপ বিলাপ ও পরিতাপ করতঃ অগত্যা যথাসময়ে স্বদেশাভিমুখে শুভযাত্রা করিলেন।

পাঠক মহাশয়গণ! দুঃখিনী বারুণী তপস্বিনীবেশে যে কোথায় গমন করিলেন, কেহই তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না। কালীঘাটে যাহাদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন, তাহারা গঙ্গাস্নানান্তে বাসায় আসিয়া বারুণীর অদর্শনে একান্ত চিন্তাকুল হন। পরে অনুসন্ধান পূর্ব্বক সুরেন্দ্রের বাসাবাটীতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা অবগত হইলে অগত্যা সকলে বিক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

স্নেহলতাকে লাভ করিয়া—স্নেহলতার রূপ গুণ দেখিয়া সুরেন্দ্র স্বীয় রঘুনাথপুরের বাটীতে এক প্রকার সুখে অবস্থিতি করিলেন বটে, কিন্তু বারুণীর চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে চির আধিপত্য স্থাপন করিল। চিন্তা-শেল তাঁহাকে দগ্ধবিদগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি আজীবন এক মুহূর্ত্তের জন্যও বারুণীকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। বারুণীর প্রতি অন্যায় আচরণ হইয়াছে ভাবিয়া এখন অনুতাপরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই পাপের নিরাশ করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

RARE BOOK
K. B. ROY
SOLE PROPRIETOR
1896